MODEL QUESTION POLITICAL SCIENCE - 1

Susmita Mukhopadhyay

Jadavpur Vidyapith

বিভাগ - ক

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির যথাসম্ভব এককথায় উত্তর দাও। সম্পূর্ণ বাক্যের প্রয়োজন নেই । (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষ্যণীয়) ঃ ১ × ১ =১০

(ক) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কয়টি বিভাগ আছে ?

উঃ ছয়টি বিভাগ

অথবা, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যসংখ্যা কত ?

উঃ দশ

(খ) 'স্পিরিট অব দ্য লজ' গ্রন্থটির প্রণেতা হলেন (হবস / লক্ / রুশো / মন্টেস্কু)।

উঃ মন্টেস্কু

(গ) ভারতের রাষ্ট্রপতি কী ধরনের শাসক ?

উঃ নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব শাসক

অথবা, পার্লামেন্টের যুগ্ম অধিবেশন আহ্বান করেন (প্রধানমন্ত্রী / রাষ্ট্রপতি / রাজ্যপাল)

উঃ রাষ্ট্রপতি

(ঘ) লোকসভায় কে সভাপতিত্ব করেন ?

উঃ স্পিকার

(ঙ) হাইকোর্টের বিচারপতিগণ (৬০ / ৬২ / ৬৫) বছর বয়স পর্যন্ত স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন।

উঃ ৬২ বছর

অথবা, জেলার সর্বোচ্চ দেওয়ানি আদালত কোর্নটি ?

উঃ জেলা জজ (District Judge) এর আদালত ।

(চ) পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা কয় কক্ষ বিশিষ্ট ?

উঃ এক কক্ষ বিশিষ্ট

(ছ) রাজ্যের প্রকৃত শাসক হলেন (মুখ্যমন্ত্রী / রাজ্যপাল / রাষ্ট্রপতি)

উঃ মুখ্যমন্ত্রী

অথবা, অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের কার্যকাল কত বছর ?

উঃ পাঁচ বছর

(জ) রাজ্যের মুখ্যসচিবকে কে নিয়োগ করেন ?

উঃ মুখ্যমন্ত্রী

অথবা, প্রতিটি মহকুমার প্রধান শাসক কে ?

উঃ মহকুমা শাসক (S. D. O.)

(ঝ) পৌরসভার সদস্যদের কী বলে ?

উঃ কাউন্সিলার

(ঞ) ব্লকের প্রধান প্রশাসনিক অধিকর্তা কে ?

উঃ বি ডি ও

অথবা, জেলাপরিষদের কার্যকাল কত বছর ?

উঃ পাঁচ বছর

বিভাগ - খ

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও । (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) ঃ ২ × ১০ =২০

(ক) নিরাপত্তা পরিষদের দুটি কাজ লেখো।

উঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হল নিরাপত্তা পরিষদ। এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ঃ --

(ক) বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং (খ) নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত ক্ষমতা।

অথবা, 'ভিটো' শব্দের অর্থ কী ? কোন্ কোন্ সদস্য ভিটো ক্ষমতার অধিকারী ?

উঃ ভিটো বলতে বোঝায় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের অসম্মতি সূচক ভোট দানের ক্ষমতাকে ।

নিরাপত্তা পরিষদের কেবলমাত্র স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রগুলি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং গণসাধারতন্ত্রী চীন) ভিটো ক্ষমতার অধিকারী।

(খ) আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিগণ কীভাবে নির্বাচিত হন ?

উঃ সাধারণসভা ও নিরাপত্তাপরিষদের পৃথক পৃথক ভাবে অনুষ্ঠিত ভোট যেসব প্রার্থী অধিকসংখ্যক ভোট পান তাঁরা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতি নির্বাচিত হন।

অথবা, মহাসচিবের দুটি কাজ উল্লেখ করো।

উঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিবের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ঃ --

(ক) প্রশাসন ও বিভিন্নশাখা সংগঠনের কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় গঠন করা এবং (খ) রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

(গ) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির তিনটি শর্ত কী ?

উঃ মন্টেস্কুর ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতির তিনটি শর্ত হল ঃ --

১) সরকারের ক্রমবিকাশ অন্যবিভাগের কাজ করবে না।

২) একবিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে না।

এবং ৩) একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত থাকবে না।

অথবা, যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় কক্ষ গঠনের নীতি কী হওয়া উচিত ?

উঃ যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় কক্ষ গঠনে সমপ্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন। তবে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় কক্ষ গঠনে এই নীতি গ্রহণ করা হয়নি।

(ঘ) অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন কাকে বলে ?

উঃ অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় আইনসভা কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব শাসনবিভাগকে দিয়ে থাকেন। এই ক্ষমতাবলে শাসনবিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে 'অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন' বলে।

অথবা, বিচারক প্রণীত আইন বলতে কী বোঝায় ?

উঃ বিচারকগণ বিচারকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে অনেক সময় প্রচলিত আইন যথেষ্ট নয় বলে

মনে করেন। সেই সকল ক্ষেত্রে তাঁরা আইনের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। আইনের ঐ সকল ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে কোনো মামলার বিচারের সময় নজির হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এইভাবে বিচারগণ প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নতুন আইনের সৃষ্টি করেন। ঐ সকল আইনকে বিচারক প্রণীত আইন বলা হয়।

(ঙ) ভারতে কয়শ্রেণীর জনপালন কৃত্যক রয়েছে ?

উঃ ভারতীয় সংবিধানে 'জনপালন কৃত্যক' বলতে সরকারের সামরিক ও সামরিক বিভাগের প্রশাসনিক কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বোঝায়।

অথবা, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কীভাবে পদচ্যুত করা যায়?

উঃ

অসদাচরণ এর জন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের রাষ্ট্রপতি অপসারণ করতে পারেন। অসদাচারণ ছাড়াও চেয়ারম্যান ও কোনো সদস্য যদি -- ১) দেউলিয়া বলে ঘোষিত হন, ২) কমিশনের সদস্য থাকলেও অন্য কোথাও বেতনভুক কর্মচারী হিসাবে কাজ করেন। ৩) মানসিক বা শারীরিক কারণে সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকার অনুপযুক্ত বলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিবেচিত হন, ৪) এছাড়াও কোনো সরকারী চুক্তির সঙ্গে জড়িত থাকেন, তাহলে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অপসরণ বা পদচ্যুত করতে পারেন।

(চ) ভারতে অখন্ড বিচারব্যবস্থা বলতে কী বোঝো ?

উঃ ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বৈতবিচার ব্যবস্থার নীতি স্বীকার করা হয়নি। পরিবর্তে সমগ্র ভারতের জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ ও সংহত বিচারব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে। একে অখন্ড বিচারব্যবস্থা বলা হয়। এই সমস্ত বিচারব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট। এছাড়া রয়েছে অঙ্গরাজ্যগুলির হাইকোর্ট এবং বিভিন্ন ধরনের অধস্তন আদালত।

অথবা, সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিদের কীভাবে পদচ্যুত করা যায় ?

উঃ

সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিদের অপশরণ করার জন্য ইমপিচমেন্ট পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

পদ্ধতিটি হল -- রাষ্ট্রপতি কোনো বিচারপতিকে সংসদের উভয়কদের মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশের এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে প্রধানত অর্থাৎ আচরণ বা অসমর্থ্যের অভিযোগের ভিত্তিতে অপসারণ করতে পারেন।

(ছ) লোক আদালতের দুটি কাজ লেখো।

উঃ বিধিবদ্ধ করে লোক আদালতকে আইনগত ভিত্তি ও স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এর দুটি কাজ হল --ঃ

(১) ন্যায়বিচারের আদর্শ, ক্ষমতা ও নিরপেক্ষতার নীতি, ন্যায় ব্যবহার ও আইনি আদর্শের ভিত্তিতে লোক আদালত পরিচালিত হয়।

(২) লোক আদালতে বিবাদ মীমাংসার রায় চূড়ান্ত এবং উভয়পক্ষই তা মানতে দায়বদ্ধ।

(জ) বিধানসভায় সভাপতিত্ব করেন কে ? তিনি কীভাবে নির্বাচিত হন ?

উঃ রাজ্য বিধানসভায় সভাপতিত্ব করেন স্পিকার বা অধ্যক্ষ। বিধানসভার অধ্যক্ষ বা স্পিকার বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে থেকেই বিধানসভার সংখ্যগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হন।

অথবা, বিধানসভার সদস্যপ্রার্থীর কী কী যোগ্যতা থাকা দরকার ?

উঃ বিধানসভার সদস্য পদ প্রার্থীকে ঃ --

১) ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।

২) কমপক্ষে প্রার্থীর বয়স ২৫ বছর হওয়া প্রয়োজন।

৩) প্রার্থী কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

৪) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা বিকৃত মস্তিষ্ক ঘোষিত হওয়া চলবে না।

৫) একই সঙ্গে বিধানসভা ও পার্লামেন্টের সদস্য থাকা চলবে না।

(ঝ) অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ কীভাবে নিযুক্ত হন ?

উঃ ভারতীয় রাজ্যপাল ১৬৪ (১) নং ধারা অনুসারে রাজ্যপাল সাধারণত রাজ্যবিধান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটের নেতা বা নেত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন।

অথবা, রাজ্যকৃত্যকের প্রধান কাজ কী ?

উঃ রাজ্যকৃত্যকের প্রধান কাজ হল ঃ -- রাজ্যসরকারের পদগুলিতে কর্মচারী নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। এছাড়াও প্রতিবছর রাজ্যপালের কাছে কার্যবলী সংক্রান্ত বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করা।

(ঞ) পঞ্চায়েত সমিতির আয়ের যেকোনো দুটি উৎস উল্লেখ করো।

উঃ পঞ্চায়েত সমিতির আয়ের দুটি উৎস হল ঃ --

১) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভূমি রাজস্বের অংশ,

এবং ২) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ।

বিভাগ - গ

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) ঃ ৫ × ৬ = ৩০

(ক) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য বর্ণনা করো।

উঃ ১৯৪৫ সালের ২৬ শে জুন সানফ্রাসিস্কো সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের দ্বারা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংবিধান সাক্ষরিত ও গৃহীত হয়। ঐ বছরই ২৪শে অক্টোবর আনুমানিকভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়।

জাতিপুঞ্জের সাংবিধানকে সনদ বলা হয়। সনদে একটি প্রস্তাবনা, ১৯টি অধ্যায় এবং ১১১টি ধারা আছে। সনদে জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য, নীতি ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

জাতিপুঞ্জের সনদের ১নং ধারায় এর চারটি উদ্দেশ্যের উল্লেখ আছে।

১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের পথে যেসব বাধাবিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে সব সদস্য রাষ্ট্র সেইসব বাধাবিপত্তি অপসারণ করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হবে।

২) সকল জাতির সমানাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা ও বিশ্বশান্তি শক্তিশালী করা।

৩) অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবতাবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্যগুলি সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতি সকল রাষ্ট্রই অনুসরণ করার চেষ্টা করবে।

জাতি, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মানবিক অধিকারও মৌলিক স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্প্রসারণ করা।

৪) জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যগুলিকে সুসংহত ভাবে পরিচালনার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ একটি কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে।

মূল্যয়ন ঃ জাতিপুঞ্জের সনদে উল্লিখিত উদ্দেস্যসমূহ তাত্ত্বিক আদর্শ হিসাবেই গুরুত্ব লাভ করেছে। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মে জাতিপুঞ্জের কাছে এই আশা রাখে যে সাম্প্রতিককালে বিশ্বরাজনীতির ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিপুঞ্জের তার উদ্দেশ্যসমূহের বাস্তব প্রয়োগ অগ্রণী হবে।

অথবা, সাধারণসভার মূল কাজগুলি আলোচনা করো।

উঃ ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ছয়টি সংস্থার মধ্যে সাধারণসভা একটি অন্যতম সংস্থা। জাতিপুঞ্জের সনদের ১০-১৭ নং ধারায় এর কার্যাবলী বর্ণিত আছে। এই সভার মূল কাজগুলি হল ঃ-

সাধারণ বির্তক ও বিশ্ব জনমত গঠন ঃ- সাধারণসভার সনদের অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়ের উপর আলোচনা চলে এবং জাতিপুঞ্জের যেকোন সংগঠনের ক্ষমতা ও কার্যাবলী পর্যালোচনা হতে পারে। সাধারণসভা ‘বিশ্বের বিতর্ক’ সভা হিসাবে পরিচিত। গেটেল একে ‘বিশ্ব নাগরিক সভা’ নামে অভিহিত করেছেন। তবে যে। সকল বিষয় নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা হয়েছে পরিষদের বিনা অনুমতিতে সেগুলো আলোচনা হতে পারে না।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ- আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাধারণসভা -- রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উন্নতি সাধন ও উন্নততর আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নে উৎসাহদান করে। এছাড়াও অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং জাতিধর্মবর্ণ ও স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে মৌলিক স্বাধীনতা লাভে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে। তবে এই সভার কোন সুপারিশ আইনের মতো কার্যকর নয়। তাই সভার এই ক্ষমতাকে ‘আধা-আইন বিষয়ক ক্ষমতা’ বলে বর্ণনা করা হয়।

পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাধান ঃ- সচিবালয়সহ জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থা এবং সংগঠনের

প্রশাসনিক কাজ পর্যবেক্ষণ করে। জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থা সাধারণসভার নিকট তাদের কাজের প্রতিবেদন পেশ করে। তবে নিরাপত্তা পরিষদের প্রদত্ত বিবরণ-এর উপর সাধারণ সভায় কোনরকম বির্তক অনুষ্ঠিত হয় না বললেই চলে।

রাজনৈতিক কাজ ঃ- ১৯৫০ সালের ৩রা নভেম্বর শান্তির জন্য সম্মিলিত হওয়ার প্রস্তাবটি গৃহিত হওয়ার ফলে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব সাধারণসভার উপর ন্যস্ত হয়েছে। জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হবার পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে ঐ বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদ কিংবা সাধারণসভায় বিষয়টি আলোচিত হবে। এক্ষেত্রে স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের ‘ভিটো’ প্রয়োগের ফলে নিরাপত্ত পরিষদ দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে সেক্ষেত্রে সাধারণ সভা সেই দায়িত্ব পালন করবে।

বাজেট প্রণয়ণ ঃ- প্রতি আর্থিক বছরে জাতিপুঞ্জের জন্য বাজেট প্রণয়ন ও তাকে অনুমোদন করা সাধারণ সভার অন্যতম কাজ। এছাড়াও কোন সদস্য রাষ্ট্রকে কত পরিমান চাঁদা দিতে হবে তা এই সভা নির্ধারণ করে। কোন সদস্যরাষ্ট্র যথাসময়ে চাঁদা না দিলে তার ভোটাধিকার বাতিল করার ক্ষমতা সভার আছে।

নির্বাচন সংক্রান্ত ঃ- নিরাপত্তা পরিষদের, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের, অছি পরিষদের সদস্যদের সাধারণ সভার দু-তৃতীয়াংশ ভোটে নির্বাচিত হতে হয়। নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী জাতিপুঞ্জের মহাসচিবকে ও আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকদের সাধারণসভা নির্বাচন করেন।

সনদ সংশোধন ঃ- জাতিপুঞ্জের সনদ সংশোধনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতিক্রমে এবং সাধারণসভায় উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি লাভ করলে কার্যকর হয়।

মূল্যায়ণ ঃ- সাধারণ একটি ‘অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান’। ব্যক্তিগত মধ্যস্থতা ও আলাপ

আলোচনার মধ্যে এর দক্ষতা সীমাবদ্ধ থাকলেও পৃথিবীর সব আইন সভার মতোই একে কাজ করতে হয়। কিন্তু, তাদের কোনটির সঙ্গে এর তুলনা করা চলে না।

(খ) আধুনিক রাষ্ট্রে শাসনবিভাগের কাজ কী কী ?

উঃ আধুনিক রাষ্ট্রকে শাসনবিভাগীয় রাষ্ট্র বলা হয়। বিখ্যাত জনপ্রশাসনবিদ লুথার গালিককে অনুসরণ করে শাসনবিভাগের কার্যাবলীকে POSDCORB নামে অভিহিত করা যায় (অর্থাৎ - P - Planning, O - Organisation, S - Staffing, D - Directing, CO - Coordinating, R - Reporting, B - Budgeting) অধ্যাপক গার্ণার শাসনবিভাগের কাজগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ঃ-

i) **প্রশাসনিক ঃ- সমগ্রদেশে** কার্যকর প্রশাসন ব্যবস্থার দ্বারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা শাসনবিভাগের প্রাথমিক দায়িত্ব।

ii) **পররাষ্ট্র বিষয়ক** ঃ- রাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশে নিজ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করা, কূটনৈতিক প্রতিনিধিবর্গ নিয়োগ ও গ্রহণ করা, সন্ধি বা চুক্তি করা এবং যুদ্ধ ঘোষণা শাসনবিভাগের অন্যতম কাজ।

iii) **আইন বিষয়ক** ঃ- অর্ডিন্যান্স জারি করা এবং হস্তান্তরিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা শাসনবিভাগকে প্রদান করা হয়। আইনসভায় গৃহিত প্রতিটি বিল প্রধান শাসকের সম্মতি লাভ করে আইন-এ পরিণত হয়।

iv) **বচার সংক্রান্ত** ঃ- বিচারালয়ের বিচারপতি নিযুক্ত করা, অপরাধীকে ক্ষমা করা, অপরাধ হ্রাস বা মুকুব করা শাসনবিভাগের কাজগুলির মধ্যে অন্যতম ।

v) **সামরিক** ঃ- দেশরক্ষার প্রয়োজনে শাসনবিভাগের অধীনে পদাতিক, নৌ ও বিমানবাহিনী নিযুক্ত থাকে।

শাসনবিভাগের আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে যেমন ঃ-

অর্থবিষয়ক ঃ- সরকারের বাজেট রচনা, অর্থের সংস্থান, বৈদেশিক ঋণগ্রহণ প্রভৃতি কার্যাবলী বাস্তবে সম্পন্ন করে শাসনবিভাগ।

জরুরী অবস্থা ঃ- প্রয়োজনে কোন জরুরী পরিস্থিতির মোকাবিলা করা, জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা এবং যথাসময়ে তা আইনসভার দ্বারা অনুমোদন করানো শাসনবিভাগের কাজ।

মূল্যায়ণ ঃ- আধুনিক যুগে শাসনবিভাগ পরিকল্পিত অর্থনীতি গ্রহণ করে ব্যাপক জন কল্যাণমুখী কর্মসূচী রূপায়ণ করে। ফলে শাসনবিভাগের কাজ বিভিন্নমুখী -- কর্মধারাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

অথবা, বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা কীভাবে রচিত হয় ?

উঃ প্রতিটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিচারবিভাগের গুরুত্ব অসীম। লর্ড ব্রাইস্-এর মতে বিচারবিভাগের কর্মকুশলতা অপেক্ষা সরকারের উৎকর্ষতা বিচারের অন্য কোনো উপযুক্ত মানদন্ড নেই। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য নির্ভীক, নির্লোভ, দুর্নীতিমুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারবিভাগ প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে গোখেল বলেছেন বিচারপতিগণ যদি দুর্নীতিপরায়ণ এবং বিকৃত মনোবৃত্তি সম্পন্ন হন, তবে ন্যায়বিচার পদদলিত হতে বাধ্য । ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

বিচারবিভাগের এই স্বাধীনতা রক্ষার কতগুলি উপায় লক্ষ্য করা যায় --

i) **বিচারকগণের যোগ্যতা ঃ-** বিচারপতিগণ ব্যক্তিগত যোগ্যতা, সততা এবং নিরপেক্ষতা বিচারবিভাগের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করার জন্য একান্ত অপরিহার্য। বিচারকেরা যদি অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ এবং কোনো দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন তবে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার পরিমন্ডলী গড়ে তোলা সত্ত্বেও বিচারবিভাগের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা যায় না।

ii) **বিচারবিভাগের নিয়োগ পদ্ধতি ঃ-** বিচারপতিদের নিয়োগ পদ্ধতির উপরেও বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। প্রধানতঃ তিনটি পদ্ধতি অনুসারে বিচারপতিগণ নিযুক্ত হতে পারেন --

a) জনগণের কর্তৃক নির্বাচন ।

b) আইনবিভাগ কর্তৃক নির্বাচন।

c) শাসনবিভাগ কর্তৃক মনোনয়ন ।

a) **জনগণ কর্তৃক নির্বাচন -**

অনেকে গণতান্ত্রিক সমাজগঠনের ক্ষেত্রে জনগণ কর্তৃক বিচারপতি নির্বাচন করাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক ল্যাস্কি এই মতকে সমর্থন করেন নি। কারণ তিনি মনে করেন -- i) অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনসাধারণ ভাবাবেগ ও দলীয় প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে অযোগ্য প্রার্থীদের বিচারপতি পদে নির্বাচন করেন। ii) আধুনিক গণতন্ত্র দলীয় শাসন হওয়ায় বিচারপতিদের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতে হলে তাদের যেকোনো প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের সমর্থন পুষ্ট হতে হয়। এর ফলে পক্ষপাতহীন বিচার সবসময় সম্ভব হয় না।

b) **আইনবিভাগ কর্তৃক নির্বাচন -**

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেমন - সুইজারল্যান্ড, আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, বেলিভিয়া প্রভৃতি দেশে এই পদ্ধতি অনুসারে বিচারপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই পদ্ধতিকেও ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করেন, কারণ --

i) এরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচনের ফলে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ মনোনীত ব্যক্তিরাই বিচারক পদে নির্বাচিত হন। তারা সদাসর্বদা আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যদি বিচারকার্য পরিচালনা করেন, তবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না।

ii) আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যরা নিজ দলের সমর্থকদের বিচারপতি পদে নির্বাচিত করেন বলে অনেকসময় যোগ্য ব্যক্তিরা বিচারপতি হিসাবে নির্বাচিত হতে পারেন না।

c) **শাসনবিভাগ কর্তৃক মনোনয়ন -**

এই পদ্ধতি অনুসারে সর্বোচ্চ শাসন কর্তৃপক্ষ বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। তবে নিয়োগের পূর্বে অন্যান্য বিচারপতি কিংবা বিচারপতিদের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি সংস্থার সাথে তিনি পরামর্শ করবেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ল্যাস্কির মত বিচারবিভাগীয় মন্ত্রীর সুপারিশক্রমেই বিচারপতিদের নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। উদাঃ- ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রের উর্ধ্বতন আদালতে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়। তবে এই পদ্ধতি অনুসরণের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনস তা না হলে --

1) শাসনবিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত বিচারপতিগণ স্বাভাবিকভাবে শাসনবিভাগ নিরপেক্ষ হয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করেত পারেন না।

2)অবসর গ্রহণের পর যদি বিচারপতিদের শাসনবিভাগীয় কোনো পদে কিংবা

কূটনীতিক হিসাবে নিয়োগ করার পথে কোনো অসুবিধা না থাকে তবে বিচারপতিগণ ভবিষ্যতে সরকারের আনুকূল্য লাভের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সরকারের সপক্ষে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারেন। তবে তুলনামূলক বিচারে শাসনবিভাগ কর্তৃক বিচারক নিয়োগ পদ্ধতি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য।

iii) **বিচারকগণের কার্যকাল -**

বিচারকগণের কার্যকালের স্থায়িত্ব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হ্যামিলটনের মতে, বিচারপতিদের স্থায়িত্ব শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষের অন্যতম পরিচায়ক। বিচারকগণের একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমা পর্যন্ত স্থায়ীভাবে নিয়োগ নিশ্চিত করা এবং অক্ষমতা ও অপরাধের কারণ ছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের আগে চাকুরি থেকে অপসারণ বন্ধ থাকলে বিচারকগণের চাকুরির নিশ্চিয়তা বজায় থাকে এবং বিচারবিভাগের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হয়।

iv) **বিচারপতিদের অপসারণ -**

কেবলমাত্র অক্ষমতা, অযোগ্যতা, দুর্নীতিপরায়ণতা, সংবিধান ভঙ্গ কিংবা গুরুতর অপরাধ (অনুধানের অভিযোগ) প্রমাণিত হলে বিচারপতিদের পদচ্যুত করা উচিত। এছাড়াও বিচারপতিদের অপসারণের জন্য বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

v) **বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা -**

বিচারপতিরা উপযুক্ত বেতন না পেলে তাদের সততা ও নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। অনেকের মতে, বিচারপতিদের বেতন - ভাতা ইত্যাদি বাবদ যে অর্থ ব্যয় করা হয় তা আইনসভার অনুমোদন সাপেক্ষে রাখা সমীচিন নয়। এছাড়াও স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তাদের বেতন-ভাতা ইত্যাদির পরিবর্তন সাধন কাম্য নয়।

vi) **বিচারবিভাগের স্বতন্ত্রতা -**

বিচারবিভাগ যাতে শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের প্রভাবমুক্ত থাকে এবং তাদের উপর যাতে নির্ভরশীল না থাকে তা সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্যতা আবশ্যক।

মূল্যায়ণ -

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা একটি রাষ্ট্রকে সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তোলার জন্য আবশ্যক।

(গ) ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরি ক্ষমতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উঃ ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক রাষ্ট্রপতিকে যেসব ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তার মধ্যে জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রপতি তিন ধরণের জরুরি ক্ষমতা ব্যবহার করে থাকেন --

i) **জাতীয় জরুরি ক্ষমতা** -- ভারতীয় সংবিধানের ৩৫২নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা সশস্ত্র বিদ্রোহজনিত কারণের জন্য দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, তাহলে তিনি সমগ্র দেশে বা দেশের কোনো অংশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। এরূপ জরুরি অবস্থা ঘোষণার বৈধতা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যায়। আবার এরূপ ঘোষণাকে ঘোষণার একমাসের মধ্যে পার্লামেন্টের কাছে উপস্থাপন করতে হয়। পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের এবং উপস্থিত ভোটপ্রদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন লাভ করলে জাতীয় জরুরি অবস্থা ৬ মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকতে পারে। এরপর প্রয়োজনীয়তা বুঝে পার্লামেন্ট পুনরায় তা ৬ মাসের জন্য এর মেয়াদ বৃদ্ধি করতে সক্ষম। তবে সর্বাধিক কতদিন পর্যন্ত এরূপ জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকতে পারবে সে বিষয়ে সংবিধানে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই।

উদাঃ হিসাবে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের জন্য ১৯৬২ সালে সর্বপ্রথম, ১৯৭১ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় দ্বিতীয়বার, আভ্যন্তরীণ কারণে ১৯৭৫ সালে তৃতীয়বার জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল।

জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে -- a) পার্লামেন্ট রাজ্যতালিকা ও যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রনয়ন করতে পারে।

b) পার্লামেন্ট লোকসভা ও রাজ্যবিধানসভার কার্যকালের মেয়াদ প্রতিবার ১ বছর করে বৃদ্ধি করতে পারে।

c) শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারে।

d) রাষ্ট্রপতি কেন্দ্র-রাজ্য রাজস্ব বন্টনে পরিবর্তন করতে পারে।

e) মৌলিক অধিকারকে কার্যকর করার জন্য সংবিধানের ৩২ ও ২২৬ নং ধারা অনুসারে আদালতে দ্বারস্থ হওয়ার অধিকারকে বাতিল বলে গণ্য করতে পারে।

f) রাষ্ট্রপতি রাজ্যকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারে।

g) সংবিধানে ৪৪ তম সংশোধনে বলা হয়েছে যে জরুরি অবস্থার সময় রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দানের মাধ্যমে ২০ ও ২১নং ধারা অনুসারে মৌলিক অধিকারগুলিকে খর্ব করতে পারে।

ii) **শাসনতান্ত্রিক জরুরি অবস্থা** --

ভারতীয় সংবিধানে ৩৫৬ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যপালের রিপোর্টের ভিত্তিতে বা অন্য কোনোভাবে যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে তিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা জনিত জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। এরূপ জরুরি অবস্থা ঘোষণার সাধারণ মেয়াদ হল ২ মাস। এই সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই ঐ ঘোষণাকে পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হতে হয়। ঐ অনুমোদন ৬ মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। এইভাবে পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভের মাধ্যমে তা ১ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকতে পারে। ৬ মাস করে বাড়িয়ে এরূপ জরুরি অবস্থা ৩ বছর পর্যন্ত বলবৎ রাখা চলে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী এখনো পর্যন্ত বহুবারই বিভিন্ন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা জারি হয়েছে।

<u>এই ঘোষণার ফল</u> -

শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা জারি হলে --

i) সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ii) রাজ্য আইনসভার যাবতীয় ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে অর্পণ করা হতে পারে।

iii) রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দিতে পারে।

iv) পার্লামেন্টের অনুমোদন ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে ঐ রাজ্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুমতি দিতে পারে।

iii) **অর্থ সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা** ঃ- ভারতীয় সংবিধানের ৩৬০ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন ভারত বা তার যেকোনো অংশের আর্থিক স্থায়ীত্ব বা সুমান বিপন্ন হয়েছে তাহলে তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। এই ধরণের ঘোষণাকে ২ মাসের মধ্যেই পার্লামেন্টের কাছে পেশ করতে হয়। পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের সম্মতি লাভে র পর এরূপ ঘোষণার মেয়াদ ৬ মাস করে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, এধরণের জরুরি অবস্থা ঘোষণা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে।

আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফল --

i) অর্থ সংক্রান্ত রাজ্যের সকল গৃহীত প্রস্তাব রাষ্ট্রপতি 'ভেটো' ক্ষমতার অধীনে আসে।

ii) রাষ্ট্রপতি সমস্ত রাজ্যগুলিকে আর্থিক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার নির্দেশ জারি করতে পারে।

iii) রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এমনকী সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি হ্রাসের নির্দেশ দিতে পারে।

iv) অর্থবিল সহ অন্যান্য যেকোনো বিল রাজ্য আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য সেগুলিকে সংরক্ষিত রাখার নির্দেশ দিতে পারে।

মূল্যায়ণ ঃ-

ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক রাষ্ট্রপতির হাতে এরূপ জরুরি ক্ষমতা প্রদানকে অনেকে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধী বলে মনে করেন। বস্তুতঃ জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকাকালে বিচারবিভাগ অপেক্ষা আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগ অনেকবেশি প্রাধান্য লাভ করায় অনেকে ভারতীয় গণতন্ত্রের বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি 'সারকারিয়া কমিশন'-এর প্রতিবেদন ৩৫৬ নং ধারা অনুসারে রাজ্যে শাসন জারির ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। ৭৫ টি ঘটনা তুলে ধরে তার মধ্যে অন্ততঃ ২৬টি ক্ষেত্রে ৩৫ ৬ নং ধারার প্রয়োগ অপরিহার্য ছিল না বলে সারকারিয়া কমিশন মন্তব্য করেছেন। K.V. Rao তাঁর "Parliamentary Democracy" নামক গ্রন্থে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে অ-যুক্তরাষ্ট্রীয়, অগণতান্ত্রিক, কূটকৌশল পূর্ণ এবং অবিবেচনাপ্রসূত বলে মন্তব্য করেছেন।

অথবা, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের মূল কাজগুলি উল্লেখ করো।

উঃ ভারতীয় সংবিধানের ৩১৫ - ৩২৩ নং ধারায় রাষ্ট্রীয় কৃত্যক কমিশন সম্পর্কে ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। ৩১৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে কেন্দ্রে একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় কৃত্যক থাকবে। একজন সভাপতি ও কয়েকজন সদস্য নিয়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় কৃত্যক কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি।

তবে কমিশনের সভাপতি ও সদস্যদের নিয়োগের ব্যাপারে মন্ত্রীসভার পরামর্শমত সদস্যদের নিয়োগের ব্যাপারে মন্ত্রীসভার পরামর্শমত চলা তাঁর পক্ষে বাধ্যতামূলক। কমিশনের সদস্যসংখ্যা কত হবে তা নির্ধারণ করেন রাষ্ট্রপতি। এইসব সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর। তবে কমিশনের আগেই যদি কেউ ৬৫ বছর পূর্ণ করেন, তাহলে তার কার্যকাল ঐ সময়ই শেষ হবে।

কার্যাবলী ঃ-

সুপ্রীম কোর্টের এক রায়ে (ডি সিল্‌ভা বনাম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৬২) বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনগুলি হল পরামর্শদাতা সংস্থা। তৎসত্ত্বেও রাষ্ট্রকৃত্যকের বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনকে কতগুলি কার্য সম্পাদন করতে হয়। ভারতীয় সংবিধানের ৩২০ নং ধারায় কমিশনে কার্যাবলী বিধিবদ্ধ করা হয়েছে --

i) কেন্দ্রীয় পরিষেবাগুলির জন্য কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলি আয়োজন ও পরিচালনা করতে হয়।

ii) এক বা একাধিক রাজ্যের অনুরোধে বিশেষ যোগ্যতা প্রয়োজন এমনস্তরের কর্মী নিয়োগের জন্য যৌথ পরীক্ষা গ্রহণে ও নিয়মাবলী প্রনয়নে ঐ রাজ্যগুলিকে সাহায্য করে।

iii)

৩২২ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতির কাছে সারা বছরের কাজকর্ম সম্বন্ধে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করাও কমিশনের অত্যাবশ্যক কাজ।

iv) যদি কোনো রাজ্যের রাজ্যপাল অনুরোধ জানান, তবে সেই অনুরোধের ভিত্তিতে এবং রাষ্ট্রপতির অনুমতি সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশন ঐ রাজ্যের কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত সকল কর্ম বা দায়িত্ব সম্পাদন করবে।

v) সরকারি কাজ বা দায়িত্ব পালক করতে গিয়ে কোনো সরকারী কর্মচারী যদি মামলায় জড়িত হয় তবে ঐ মামলা সংক্রান্ত ব্যয় সম্পর্কে পরামর্শদান করাও কমিশনের কাজ।

যদি রাষ্ট্রপতি নিম্নোক্ত বিষয়গুলিতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের পরামর্শ চান, তবে ঐ পরামর্শ দেওয়া কমিশনের পক্ষে বাধ্যতামূলক। তবে সুপ্রীম কোর্ট মনে করে কোনো কমিশনের পরামর্শ চাওয়া ও মানা রাষ্ট্রপতির পক্ষে বাধ্যতামূলক হয় না। যেসব বিষয় গুলি হয় --

i) সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত সরকারি পদগুলিতে নির্বাচনের পদ্ধতিগুলি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে।

ii) সরকারি কর্মীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি সংক্রান্ত নীতিগুলি স্থির করার ক্ষেত্রে।

iii) যদি কোনো ব্যক্তিকে সরকারি কর্মী হিসাবে কাজ করার জন্য মামলা-মোকদ্দমার সম্মুখীন হতে হয় এবং যদি ঐ ব্যক্তি মামলার খরচের জন্য ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ দাবি করে, তবে সেই ক্ষেত্রে।

iv) যদি কোনো ব্যক্তি অসামরিক সরকারি কাজ সম্পাদনের সময় আঘাত পেয়ে থাকে এবং সেই ব্যাপারে পেনশন দাবি করে তবে সেই বিষয়ে ও পেনশনের পরিমাণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সাথে পরামর্শ করা আবশ্যক।

মূল্যায়ণ ঃ-

ভারতের রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনগুলির দায়িত্ব মুখ্যতঃ দ্বিবিধ। যেমন - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বলা হয় "to keep the ruscals out" এবং যোগ্যতমদের চয়ন করা।
ভারতের মত অতিবৃহৎ গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে সরকারের স্থায়ী ও দক্ষ কর্মীকাঠামো গড়ে তোলার এবং নিয়মিত কর্মী প্রবাহ যোগান দিয়ে সেই কাঠামো অক্ষুন্ন রাখতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্যায়ের রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনগুলির যে প্রধান অবদান আছে তা বলাই বাহুল্য। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনকে নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য সংবিধানে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তা মোটামুটি সন্তোষজনক। অনেকসময় দেখা যায় কমিশনের সাথে পরামর্শ না করেই সরকার গুরুত্বপূর্ণ পদে অস্থায়ী নিয়োগ করে এবং পরে ঐ নিয়োগকে অনুমোদন করার জন্য কমিশনকে অনুরোধ করে।

(ঘ) পার্লামেন্ট বা সংসদে বিরোধীদলের ভূমিকা উল্লেখ করো।

উঃ গণপরিষদে ভারতের জন্য বিধিবদ্ধ নতুন সংবিধানে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদ বা পার্লামেন্ট সংবিধানের ৭৯নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতিসহ সংসদের উভয়কক্ষকে বোঝায়।

সংসদে যে দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দল সরকার গঠনের সুযোগ পায় এবং অন্যান্য দল বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে।

এই বিরোধী দলের ভূমিকার উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। সরকারীদলের **অগণতান্ত্রিক ও জনস্বার্থ-বিরোধী** কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করে বিরোধী দল **নিজ অনুকূলে জনমত গঠনের চেষ্টা করে।**

সরকারী দল যাতে স্বৈরাচারী হয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করতে না পারে, সেজন্য বিরোধী দলকে সদা-সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। তবে এ প্রসঙ্গে **গঠনমূলক সমালোচনার** মধ্য দিয়ে সরকারের বিরোধীতায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। যে কোন রূপ **উন্নয়নের প্রশ্নে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে** প্রয়োজনে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব তৈরী করতে হবে।

সুসংগঠিত বিরোধীদলের অভাবে সরকারের ত্রুটি বিচ্যুতির কার্যকর বিরোধিতার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না।

ভারতের নবম লোকসভা নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে কোনো শক্তিশালী বিরোধী দলের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি। নবম লোকসভা নির্বাচনে সংসদে কংগ্রেস (ই) দলের একাধিপত্য বিনষ্ট হয়, বি.জে.পি এবং বামপন্থী দলগুলির সহযোগিতায় রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার গঠন করলে কংগ্রেস (ই) একটি শক্তিশালী বিরোধীদলের ভূমিকা পালন করে। নবম লোকসভা থেকে শক্তিশালী বিরোধী দলের অবস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, সংসদে শক্তিশালী বিরোধী দলের অবস্থিতি গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান রক্ষা কবচ। তবে সংসদে বিরোধীদলের অবস্থান কেবলমাত্র সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা করাই নয় রাষ্ট্র তথা রাজ্যগুলির উন্নয়নে সামগ্রিকভাবে দলীয় স্বার্থ, ক্ষমতার লড়াই এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টিতে সাহায্য না করে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে সরকারকে সাহায্য করা।

(ঙ) ভারতের বিচারব্যবস্থায় সুপ্রীমকোর্টের ভূমিকার মূল্যায়ন করো।

উঃ সুপ্রিমকোর্টকে ভারতীয় বিচারবিভাগীয় তোরণের ভিত্তিপ্রস্তর বলা যেতে পারে। এই আদালতের প্রাথমিক কাজ হল দেশে আইন যথাযথভাবে প্রযুক্ত ও প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা এবং কোনো বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থীকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। এই উদ্দেশ্যে সুপ্রীমকোর্টকে একটি অখন্ড বিচার সংগঠনের শীর্ষদেশে স্থান দেওয়া হয়েছে। দেশের সমগ্র বিচার সংগঠনের শীর্ষদেশে থাকায়, সুপ্রীম কোর্ট ঐক্যবন্ধনের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে।

ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মৌলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন আদালতের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিচার এলাকা মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের তুলনায় অধিকতর সম্প্রসারিত।

মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক এবং আইন ও সন্ধির বৈধতা সংক্রান্ত মামলার আপিল আদালত হিসাবে কাজ করে। কিন্তু ভারতের সুপ্রীম কোর্ট **ফৌজদারি ও দেওয়ানী** মামলার আপিল আদালত হিসাবেও কাজ করে।

তবে সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকা ততটা ব্যাপক নয়। সুপ্রীম কোর্টের মূল বিচার এলাকার প্রথম মামলা হয় ১৯৬৩ সালে। কোন বিবাদের দুপক্ষে যেখানে রাজ্য বা কেন্দ্র জড়িত নয় সে ধরণের কোনো মামলা সুপ্রীম কোর্টের মূল এলাকায় তোলা যায় না। বর্তমান সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি, সন্ধি, অঙ্গীকার ইত্যাদি সংক্রান্ত কোন বিরোধ সুপ্রীমকোর্টের মূল বিচার এলাকাতে তোলা যায় না।

ভারতে সুপ্রীমকোর্টের কাছে রাষ্ট্রপতি জনস্বার্থের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো বিষয়ে পরামর্শ চাহিতে পারেন। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের 'বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তার' একটি উদাহরণ হল ঃ- ১৯৯০ সালে হাওয়ালা কেলেঙ্কারিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য সিবিআই কে নির্দেশ দান। সুপ্রিমকোর্ট তার দীর্ঘ যাত্রা পথে ভারতীয় সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা, মৌলিক অধিকারের রক্ষাকর্তা, তথা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। এর মধ্যে বেশ কিছু রায় সমপরিবর্তনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বলে চিহ্নিত হয়েছে। যে মন - বেগার শ্রমিকদের মুক্তি ও পুর্নবাসন সংক্রান্ত মামলায় সরকারকে নির্দেশ দান (১৯৮৩), সাহাবানু মামলায় তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলাদের ভরণ-পোষণ বহন করার জন্য স্বামীকে নির্দেশ দান (১৯৮৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সংবিধানের ১২৯ ধারা অনুযায়ী সুপ্রীমকোর্ট নথি-আদালত হিসাবে কাজ করে। জনগণের মৌল অধিকার প্রয়োগের জন্য সংবিধানের ৩২নং ধারায় সুপ্রীমকোর্টকে লেখ জারির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আইনসভা প্রণীত আইন সংবিধান সম্মত বা বৈধ কিনা ভারতের সুপ্রীম কোর্ট তা বিচার করার সীমিত ক্ষমতার অধিকারী। যা বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা নামে পরিচিত।

মূল্যায়ণ ঃ-

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতের সুপ্রীমকোর্ট ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। সুপ্রীমকোর্টের ভূমিকার মূল্যায়ণ করে বলা যায় -- শ্রী দুর্গাদাস বসুর মতে, পৃথিবীর যেকোন দেশের সর্বোচ্চ আদালত অপেক্ষা চরিত্র ও ব্যপ্তির দিক থেকে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ার ও ক্ষমতা বেশি।

অথবা, মৌলিক অধিকার রক্ষায় হাইকোর্টের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

উঃ ভারতের অখন্ড বিচারব্যবস্থার প্রাদেশিক শাখাগুলি হল বিভিন্ন রাজ্য অবস্থিত হাইকোর্ট সমূহ। ভারতীয় সংবিধানের ২১৪ নং ধারা অনুসারে প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে হাইকোর্ট থাকবে। সংবিধানের ২৩১(১) ধারা অনুসারে পার্লামেন্ট আইনকরে দুই বা ততোধিক রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য একটি হাইকোর্ট গঠন করতে পারে। বর্তমানে ভারতে অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা ২৪, কিন্তু হাইকোর্টের সংখ্যা ২১। বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের এলাকাধীন হল পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দীপপুঞ্জ।

ভারতের সংবিধানে হাইকোর্টের এক্তিয়ার ও কার্যকলাপ বিস্তৃতভাবে বিধিবদ্ধ করা হয় নি। সংবিধানের ২২৫নং ধারায় হাইকোর্টের কাজকর্মের এক্তিয়ার সম্পর্কে শুধুমাত্র বলা হয়েছে যে, সংবিধান কার্যকর হওয়ার সময়ে হাইকোর্টের কাজকর্মের যে এক্তিয়ার ও ক্ষমতা ছিল হাইকোর্ট সেগুলো ভোগ করবে।

সংবিধানের ২২৬ নং ধারা অনুসারে হাইকোর্টগুলি নাগরিক অধিকার বলবৎ করার জন্য **আদেশ, নির্দেশ ও লেখজারি** করতে পারে। হাইকোর্ট তার ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে বসবাসকারী নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও গুরুদায়িত্ব পালন করে। এই উদ্দেশ্যে হাইকোর্ট বন্দিপ্রত্যক্ষীকরণ, পরামাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকারপৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ প্রভৃতি লেখ জারি করতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ৩২নং ধারা অনুযায়ী সুপ্রীমকোর্ট কেবলমাত্র মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য লেখ জারি করতে পারে, কিন্তু হাইকোর্টগুলি মৌলিক অধিকার এবং অন্যান্য-আইনগত অধিকার বলবৎ করার জন্যও লেখ জারি করতে পারে।

যদিও কেন্দ্রীয় সংসদ ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইনে এই ক্ষমতার ব্যাপক সংকোচন করেন। পরবর্তী সময় ৪৪তম সংশোধনী আইনে এই ক্ষমতা

হাইকোর্টকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই সংশোধনী আইন অনুসারে হাইকোর্টে বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ জাতীয় লেখ জারির ক্ষমতা জরুরী অবস্থার সময়েও খর্ব করা যাবে না।

তবে হাইকোর্ট অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে নানাবিধ ক্ষমতার অধিকারী হলেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত অপেক্ষা কম ক্ষমতা ভোগ করে। যেমন ঃ- দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে রাষ্ট্রপতি আদেশ জারির মাধ্যমে ২০ ও ২১ নং ধারায় প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি ছাড়া অন্যসব মৌলিক অধিকার সমূহ বলবৎ করার জন্য হাইকোর্টের কাছে আবেদন করার অধিকার বাতিল করে দিতে পারেন।

মূল্যায়ণ ঃ-

পরিশেষে বলা যায়, পদমর্যাদায় সুপ্রীমকোর্টের সহায়ক হলেও দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে হাইকোর্টগুলি যথেষ্ট স্বাধীনতা ও মর্যাদা ভোগ করে। সর্বোপরি, নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের রক্ষাকর্তা হিসাবে হাইকোর্ট অতিগুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভোগ করে।

(চ) রাজ্য আইনসভার গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করো।

উঃ ভারতের সংবিধানের ১৬৮নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যের আইনসভার একটি বা দুটি কক্ষ থাকতে পারে। এই দুটি কক্ষ হল বিধানসভা ও বিধান পরিষদ। নিম্নকক্ষটি বিধানসভা ও উচ্চকক্ষটি বিধান পরিষদ নামে পরিচিত।

গঠনঃ- কোনো রাজ্যের বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা সেই রাজ্যের বিধানসভার সদস্য সংখ্যার একতৃতীয়াংশ অধিক হতে পারবে না। তবে বিধান পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ৪০-এর কম হবে না। নির্বাচিত ও মনোনীত উভয় ধরনের সদস্য নিয়ে বিধান পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদের মোটামুটি ৬ ভাগের ৫ ভাগ সদস্য পরোক্ষভাবে নির্বাচিত এবং ১ ভাগ সদস্য রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হন। এই পরিষদের কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর।

বিধানসভার সদস্য সংখ্যা সর্বাধিক ৫০০ এবং সর্বনিম্ন ৬০ হতে পারে। এটি একটি জনপ্রতিনিধি কক্ষ। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বিধানসভার সদস্য গণ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য সংখ্যা ২৯৪ জন। এই সভার সাধারণ কার্যকালের মেয়াদ ৫ বছর।

কার্যাবলী ঃ-

i) আইন প্রণয়ণ সংক্রান্ত ঃ- রাজ্য আইনসভা সমগ্ররাজ্য বা রাজ্যের যেকোন অংশের জন্য আইন প্রণয়ণ করতে পারে। রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়েও রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়ণ করতে পারে। তবে এই তালিকার ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট প্রণীত আইনই প্রাধান্য পায় -- অর্থাৎ রাজ্য আইনের যে অংশটি কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সেই অংশটি বাতিল হয়ে যায়। তবে রাজ্য আইনসভার ঐ রকম আইন যদি রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করে থাকে তবে তা কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধী হলেও বাতিল হয়ে যাবে না। রাজ্য আইনসভা কর্তৃক গৃহীত বিলে রাজ্যপাল সম্মতি না দিয়ে তা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠাতে পারেন।

ii) শাসনবিভাগ গঠন ও নিয়ন্ত্রণ ঃ- সংসদীয় ব্যবস্থার নিয়ম অনুসারে বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই রাজ্যের মন্ত্রীসভা গঠন করেন। বিধান পরিষদ থেকে ও মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্য নিয়োগ করতে পারেন। তবে সাধারণত মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা র সদস্য হন। রাজ্যের মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার সময় কোনো ব্যক্তি যদি রাজ্য আইনসভার সদস্য না থাকেন তাহলে নিযুক্ত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে তাঁকে আইনসভার সদস্যপদ গ্রহণ করতে হয়। সংবিধানের ১৬৪(২) ধারা অনুসারে রাজ্যের মন্ত্রীসভাকে বিধানসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনের ওপর রাজ্যমন্ত্রী সভার কার্যকাল নির্ভরশীল। রাজ্যপালের উদ্বোধনী ভাষণের উপর বির্তক, বা ভোট -বিতর্ক, প্রশ্নজিজ্ঞাসা, মুলতুবি প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব প্রভৃতির মাধ্যমে বিধানসভা মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ও সংযত রাখতে পারে।

iii) অর্থ সংক্রান্ত ঃ- রাজ্য সরকারের কর ধার্য, কর সংগ্রহ ও ব্যয় বরাদ্দের ক্ষমতা বিধানসভা নিয়ন্ত্রণ করে। বিধানসভার অনুমোদন ছাড়া ঐ ব্যয়গুলি সম্ভব নয়। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় হিসাবে গণ্য হয়।

iv) সংবিধান সংশোধন ঃ- ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় স্বার্থ সম্পর্কিত কতকগুলি বিষয়ে সংবিধান সংশোধনের জন্য অন্তত অর্ধেক রাজ্য আইনসভার অনুমোদন প্রয়োজন। যেমনঃ- কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কবন্টন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে।

রাজ্য আইনসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি ছাড়াও বিধানসভায় মন্ত্রীরা সদস্যদের যে বিবিধ প্রশ্নের জবাব দেন সেগুলি গণ মাধ্যমের সাহায্যে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে যায়। এর ফলে জনগণ সরকারী কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হবার সুযোগ পান।

অথবা, জেলাশাসকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি আলোচনা করো।

উঃ রাজ্যপ্রশাসনের বিকেন্দ্রীকিত রূপ হল জেলা প্রশাসন। স্বাধীনতার পর জেলা প্রশাসনের সংগঠন ও কার্যকারীতা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যকের অঙ্গ হিসেবে সরাসরি মেধার ভিত্তিতে এবং রাজ্যকৃত্যক থেকে পদোন্নতির ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক নিযুক্ত হন। জেলা শাসকের জেলার উন্নয়ন ও কর্মকান্ডের মেরুদন্ড হিসেবে অভিহিত করা হয়। তিনি হলেন জেলা প্রশাসনের প্রধান স্তম্ভ ও সর্বোচ্চ কেন্দ্র বিন্দু।

বর্তমানে জেলা প্রশাসককে যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হয় সেগুলি হল ঃ-

i) **জেলার রাজস্ব সংগ্রাহক হিসেবে দায়িত্ব ঃ-** ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ; কর আদায়, সরকারি খাতে প্রাপ্য আদায় কৃষিকার্যের জন্য দেয় সরকারি ঋণ আদায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্ষতির হিসাব, ক্ষতিপূরণ ও সাহায্যের ব্যবস্থা, সম্পত্তির পরিচালনা পুনঃবাসনের জন্য অর্থ প্রদান, কৃষি - আয়কর নির্ধারণ, জমিউদ্ধার ও অর্জন, সরকারি কোষাগার সংরক্ষণ, ইত্যাদি কা জ রাজস্ব সংগ্রাহক হিসেবে জেলা শাসকের এলাকায় পরে।

ii) **জেলাশাসক হিসেবে ভূমিকা ঃ-** জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব প্রধানত মেজিস্ট্রেট হিসেবে জেলার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা। জেলার শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে যে সকল কারণে সে সব বিষয়ে জেলাশাসককে সর্তক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং রাজ্যসরকারে অবহিত রাখতে হবে। জেলার পুলিশবাহিনী এক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানেই দায়িত্ব পালন করে। পুলিশ প্রশাসনের ক্ষেত্রে অবশ্য ম্যাজিস্ট্রেটের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তবে থানা, পুলিশ চৌকি বা চেকপোষ্টগুলিকে পর্যবেক্ষণ করার অধিকার তার আছে।

iii) **জেলার সমন্বয়কারী অধিকর্তা ঃ-** জেলাশাসক জেলার সরকারি কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেন। যদিও এই কাজটির ক্ষেত্রে তার এলাকা সম্পূর্ণভাবে নির্ধারিত হয়নি। জেলার বিচারকর্তৃপক্ষ, পুলিশ কর্তৃপক্ষ, বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের বা শাসন বিভাগীয় সংস্থার ওপরে তার নিয়ন্ত্রন নেই। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে তিনি যে ভূমিকা পালন করেন তা হল, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা সভা আহ্বান করা। এই আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থাগুলি কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা বা জটিলতা থেকে কিভাবে মুক্ত থাকা যাবে বা এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব কী তা খোলাখুলি আলোচনা করতে পারে।

iv) **জেলার উন্নয়ন আধিকারিক ঃ-** জেলার জেলাশাসক জেলার উন্নয়ন

আধিকারিক হিসেবে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করতে হয়। জেলা উন্নয়নের যাবতীয় কর্মসূচী যেমন - শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিয়োগ, গৃহ নির্মান, নারী-শিশু অনগ্রসর মানুষের জন্য বিশেষ কর্মসূচী - - যা সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয় এবং ৭০ বা ৮০-এর দশক থেকে যে সব উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েচে তার রূপায়নে জেলা প্রশাসনের পক্ষে সবচেয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হয় জেলাশাসককে। কারিগরি সহায়তা, ঋণ, পরিকল্পনা অগ্রাধীকার, বন্যা ও খরা প্রবণ এলাকার কর্মসূচী, স্বনির্ভর নিযুক্তি, কর্মসূচী প্রেরণের সর্বক্ষেত্রেই জেলাশাসক হলেন জেলার সর্ব্বোচ্চ কর্মাধ্যক্ষ। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্প ও সংস্থার তিনি পদাধিকার বলে সভাপতি হন বা উচ্চপদে থাকেন। এক্ষেত্রে জেলাশাসক রাজ্য সরকারের হয়েই দায়িত্ব পালন করেন।

v) **অন্যান্য কাজ ঃ-** জেলাশাসককে অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে হয়। এগুলির মধ্যে অন্যতম (a) জেলাশাসক হলেন জেলার সঙ্কট মোচনের প্রধান। (b) তিনি জেলার শিষ্টাচার আধিকারিক, (c) তিনি জেলার জনগণনা অধিকর্তা, (d) সংসদীয় বিধানসভা নির্বাচনে তিনি রিটার্নিং আধিকারিক হিসেবে কাজ করেন। (e) জেলার উৎসব অনুষ্ঠানে তিনি ই সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। (f) খাদ্য সরবরাহ ও নিত্য প্রয়োজনী য় দ্রব্যের সরবরাহে যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে সে ব্যাপারে তাকেই দৃষ্টি রাখতে হয়। (g) জেলার বার্ষিক প্রশাসনিক রিপোর্ট তৈরি ও রাজ্য সরকারের কাছে তা পেশ করা তার বিশেষ কাজ। (h) সরকারি কোষাগার সংরক্ষণ, আঞ্চলিক পরিবহন ও সড়ক ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ, পর্যটক কেন্দ্র ও অরণ্য সংরক্ষণ, জমি পরিচালনার নানা বিষয়ে এবং জেলা পরিদর্শনের কাজে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকেন।

মূল্যায়ণ ঃ-

ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্র থাকায় মন্ত্রীরা তাদের কাজের জন্য আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ। তাই জেলাশাসকের কাছে জেলা সরকারী শেষ কথা বলার সুযোগ বা অধিকার নেই। বর্তমানে বিকেন্দ্রীকরণ ও তৃণমূল স্তর পর্যন্ত বিকেন্দ্রীভূত কার্যপদ্ধতি প্রয়োগের ফলে জেলাশাসকের হাত থেকে কার্যত বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে তবে বর্তমানে অতিরিক্ত জেলাশাসকের হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব প্রদানের ফলে জেলাশাসকের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিভাগ - ঘ

৪। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষ্যণীয়) ঃ ১০ × ৪ = ৪০

(ক) জোটনিরপেক্ষতা কাকে বলে ? এর বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করো।

উঃ জোট নিরপেক্ষতা কোনো নেতিবাচক ধারণা নয়, এটি একান্ত একটি ইতিবাচক, গতিশীল ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বা আবেদন জহরলাল নেহরুর মতানুসারে। বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতাকে সুনিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত একটি ব্যাপক নীতির অংশ বিশেষ জোট নিরপেক্ষতা। জোট নিরপেক্ষতার অর্থ কখনোই নিঃসঙ্গত নিরপেক্ষতা বা নিষ্ক্রিয়তা বা আপোষ বা সুবিধাবাদ নয়। স্বাধীন জাতিগুলির রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষা করে শান্তির পরিবেশ দেশ গঠনের সমবেত ইচ্ছা থেকেই জোট নিরপেক্ষ চিন্তাধারা উৎসারিত হয়েছিল। নিরপেক্ষ দেশগুলির পথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিয়েতনাম নীতি বা সোভিয়েত ইউনিয়নে হাঙ্গেরিতে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হওয়া সম্ভব যা কোনো জোটভুক্ত রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। এটি হল গঠনমূলক সক্রিয় ও সদর্থক নীতি। এর মাধ্যমেই যৌথ নিরাপত্তার ভিত্তি গড়ে তোলা সম্ভব। এর লক্ষ্য যৌথ শান্তি।

নেহরু, নাসের, টিটো জোট নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্বীকৃত। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত সমূহের মধ্যে রক্ষণশীল সৌদি আরব ও মরক্কো পুঁজিবাদী সিঙ্গাপুর, আবার সাম্যবাদী উত্তর কোরিয়া, কিউবা, ভিয়েতনামও আছে। ১৯৫৫ সালে বান্দুং সম্মেলনে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬১ সালে ২৫ টি সদ্য স্বাধীন দেশ নিয়ে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন রূপ নেয় বেলগ্রেড সম্মেলনে।

জোট নিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য ঃ-

কতগুলি নীতির ভিত্তিতে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেগুলি জোট নিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য রূপে পরিচিত ঃ-

১৯৫৪ সালে চীন ও ভারতের মধ্যে - 'পঞ্চশীল' সম্পাদিত হয়। এর পাঁচটি নীতি জোটনিরপেক্ষতার বিকাশে সহায়তা করেছে। এইগুলি হল - i) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, ii) রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও সার্বভৌমিকতার প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, iii) অনাক্রমণ, iv) অপরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নির্লিপ্ততা, v) সাম্য ও পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা।

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অংশীদার রাষ্ট্রসমূহ সাধারণত কতকগুলি নীতির প্রতি আস্থা জ্ঞাপন ও অনুসরণ করে। এইগুলি হল ঃ-

i) সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি,

ii) প্রত্যেক দেশের সার্বভৌমিকতাকে মর্যাদা প্রদান,

iii) যেকোন জাতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন,

iv) বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান,

v) শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধের মীমাংসা,

vi) কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখন্ডতার হস্তক্ষেপ না করা,

vii) উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য সহযোগিতা,

viii) ব্যক্তি মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সমূহের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ

ix) জাতিপুঞ্জের নীতি ও উদ্দেশ্য সমূহ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা মান্য করা।

পরিশেষে বলা যায়, জোট নিরপেক্ষতা হল একটি আন্দোলন। এর প্রতিষ্ঠা, রূপদান, নীতি নির্ধারণ এবং নেতৃত্বদানের ব্যাপারে ভারতের অবদান সর্বাধিক। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি, সম্প্রীতি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই আন্দোলন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। তবে বর্তমানে বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে অধিকতর অর্থবহ কর্মসূচী অবলম্বন করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন ও আইনের গণতন্ত্রীকরণ করতে হবে।

অথবা, বিশ্বায়ন কাকে বলে ? বিশ্বায়নের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য আলোচনা করো।

উঃ বিভিন্ন দেশের জাতীয় অর্থনীতির প্রাঙ্গণে ‘বিশ্বায়ন’ নামটি একটি আর্ন্তজাতিক সংস্কার প্রক্রিয়া যা এক নিঃশব্দ অর্থনৈতিক বিপ্লবের সূচনা করে চলেছে। বিশ্বায়ন হল মানুষ, গোষ্ঠী, বাণিজ্যিক সংস্থা ও রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি সংহতি ও সমন্বয়মূলক বহুমুখী প্রক্রিয়া। ডেভিড হেল্ড বিশ্বায়নকে কার্যকলাপ, মিথোস্ক্রিয়া ও ক্ষমতার আন্তঃমহাদেশীয় কিংবা আন্তঃআঞ্চলিক প্রবাহ ও নেটওয়ার্ক বলে বর্ণনা করেছেন। অনেকে বিশ্বায়ন বলতে ‘সীমারেখা হীন বিশ্ব’ এর কথা বলেছেন।

বিশ্বায়ন হল ঠান্ডাযুদ্ধের পরবর্তীকালের অভিব্যক্তি, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ১৯৯৪ সালে উরুগুয়ে আলোচনার মাধ্যমে General Agreement on Tarrifs and Treads এবং ১৯৯৫ সালে 'বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা' গঠন করা হয়। বিশ্বায়ন হল জাতিরাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক সীমানা ছাড়িয়ে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সম্প্রসারণ। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার ভিত্তি এবং মুনাফা অর্জনের প্রলোভনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বায়নের প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

বিশ্বায়নের প্রকৃতিকেই বিভিন্ন দিক থেকেই আলোচনা করা যেতে পারে। তিনটি প্রধান আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বায়নকে নিয়ন্ত্রণ করে -- i) আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার ii) বিশ্বব্যাঙ্ক ও iii) বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা। বিশ্বায়ন যে চারটি স্তম্ভের উপর দন্ডায়মান, সেগুলি হল -- বেসরকারিগণ, আর্থিক কৃচ্ছ্র সাধন, উদারিকরণ এবং বিদেশী বিনিয়োগ।

i) আর্থিক দিক --

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন হল মুক্ত অর্থনীতির দ্যোতক। বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদী ব্যবস্থার অবক্ষয় অবসান অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ধারাকে উজ্জীবিত করেছে। আর্থিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি হল --

a) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার

b) বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে অভিগমন ও নির্গম

c) বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থ ও অন্যান্য বিনিময় মাধ্যমের সঞ্চালন।

d) একদেশের পুঁজি অন্যদেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে সেখানে শিল্পজাত দ্রব্য আসে। পরিষেবামূলক পণ্য উৎপাদন করে বিক্রয়ের প্রবাহ সৃষ্টি।

e) একদেশ থেকে অন্যদেশে লগ্নিপুঁজির আদান-প্রদান।

f) বহুজাতিক বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসংস্থাগুলিকে বাণিজ্য বিনিয়োগ ও উৎপাদনের অবাধ স্বাধীনতা প্রদান।

g) বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রযুক্তির আদানপ্রদান।

অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন হল স্বতন্ত্র জাতীয় অর্থনীতিসমূহের দুনিয়া ছেড়ে বিশ্ব অর্থনীতির দুনিয়ার চলে আসা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন হল মুক্ত অর্থনীতির দ্যোতক।

ii) **রাজনৈতিক ক্ষেত্র ঃ-**

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক মতাদর্শের উদাহরণ হিসাবে উদারনীতিবাদের রূপান্তরের কথা বলা হয়। রাজনৈতিক বিশ্বায়নের অভিব্যক্তি ঘটেছে আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের মধ্যে। এইসব সংগঠনের কার্যকলাপ জাতির সীমারেখাকে ছাড়িয়ে যায়। বর্তমান বিশ্বে বহু ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন বর্তমান। এগুলির অধিকাংশই গঠিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে যেমন -- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিউনিটি, বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের সংগঠন, প্রভৃতি নীতি-তত্ত্বগত বিচারে জাতি রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের সার্বভৌমতাকে বিসর্জন না দিয়েও আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের মাধ্যমে সুসংহত ও সংগঠিতভাবে কোনো বিষয়ে উদ্যোগ, আয়োজন গ্রহণ করতে পারে।

iii) **সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র -**

বিশ্বায়নের লক্ষ্য হল বিশ্বব্যাপী একটি সমরূপ সংস্কৃতি গড়ে তোলা। ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন আধুনিক গণমাধ্যমের সাহায্যে এরূপ সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে আন্ত র্জাতিক গণমাধ্যম কর্পোরেশনগুলি আত্মনিয়োগ করে। তারা সাংস্কৃতিক প্রভাবকে জাতি-রাষ্ট্রের গন্ডি ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াকে ''ম্যাকডোনাল্ডিকরণ'' নামে অভিহিত করা হয়। এটি হল একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর একটি অংশে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী, ধ্যানধারণা ও তথ্যাদি এক বিশ্বধারার সামিল হয়ে পড়ে। বিশ্বায়নের উপাদান বা ব্যক্তিসমূহ সংস্কৃতির দ্বারা সমৃদ্ধ হয় এবং প্রতিহত ও হয়।

মূল্যায়ণ ঃ-

অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় অরাষ্ট্রীয় ও বাজারভিত্তিক

ক্রিয়াকারীদের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রাজনৈতিক বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে আন্তঃ রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের উপর জোর দেওয়া হয়। স্বভাবতই রাজনৈতিক বিশ্বায়ন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন থেকে আলাদা হয়। রাজনৈতিক বিশ্বায়নের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতি আদর্শবাদী অঙ্গীকার বর্তমান। তাছাড়া এর মধ্যে বিশ্বসরকারের ধারণার অস্তিত্ব ও অস্বীকার করা যায় না। আন্তর্জাতিক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ, বেসরকারি সংগঠনসমূহ, আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনসমূহ প্রভৃতির মাধ্যমে বিশ্বনাগরিক সমাজের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।

(খ) মার্কস্‌বাদের মূল সূত্রগুলি আলোচনা করো।

উঃ জীবনবোধ থেকে মার্কসবাদের উদ্ভব। মার্কস্‌বাদ হল সৃজনশীল দর্শন, মার্কসবাদ হল বিজ্ঞান। মার্কস্‌বাদ হল আমাদের এই জগৎ এবং তার অংশ, মানবসমাজ সম্পর্কে সাধারণ তত্ত্ব। এঙ্গেলস্ বলেছেন ডারউইন যেমন জীব জগতের বিবর্তনের নীতি আবিষ্কার করেছিলেন, মার্কস্ তেমনি মানব ইতিহাসে বিবর্তন সূত্র আবিষ্কার করেছেন। মার্কস্‌বাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে ঊনিশ শতকের চারের দশকে। মানুষের চিন্তার জগতে এক যুগ সন্ধিক্ষণ ঘটে। মার্কস্‌বাদের উৎস হিসাবে যেসকল তাত্ত্বিক চিন্তাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় সেগুলো তিনটি প্রধান তত্ত্ব ভাগে বিভক্ত ---

i) ব্রিটিশ রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি

ii) ফরাসি সমাজতন্ত্রের ধ্যান ধারণা

iii) জার্মান ভাববাদী দার্শনিকদের চিন্তাধারা।

মার্কস্‌বাদের মৌলিক নীতিগুলি হল --

(a) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (b) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (c) উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব (d) রাষ্ট্রতত্ত্ব (e) শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব (f) বিপ্লবের তত্ত্ব।

(a) দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ঃ-

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মার্কস্‌বাদের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হিসাবে পরিচালিত হয়। মার্কসের পূর্বেই ভাববাদী দার্শনিক হেগেল দ্বন্দ্বতত্ত্বের একটি সুস্পষ্ট রূপ দেন। হেগেলের ধ্যান ধারণা অনুযায়ী বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের সব কিছুই এক অতীন্দ্রিয় পরমাত্মার দান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। তবে মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ সমাজ পরিবর্তনকে বিশ্লেষণ করে দেখান যে বস্তু জগতের অস্তিত্ব ভাবজগতের ওপর নির্ভরশীল নয় এবং কোনো আলৌকিক শক্তির ইচ্ছায়

বস্তুজগৎ সৃষ্টি হয় না। বস্তুজগতের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার ফলে বস্তুজগৎ তথা সমাজের পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। মার্কস্‌বাদী তত্ত্ব অনুসারে --

প্রথমতঃ, প্রকৃতিগত কারণেই বিশ্ব বস্তুময়। তার প্রতিটি জিনিস উৎপত্তির পিছনে থাকে বাস্তব কারণ ।

দ্বিতীয়তঃ মনের বাইরে মন নিরপেক্ষ বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে এবং মানসিক বিষয় বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

তৃতীয়তঃ, জগৎ ও তার বিকাশের নিয়ম সম্পর্কিত সমস্ত জিনিস মানুষ আয়ত্ত করতে পারে।

মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ মূলতঃ তিনটি সূত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে --

i) বস্তুর মধ্যে নিহিত গতিশীলতা সবসময়ই পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে গুণগত পরিবর্তন ঘটায়।

ii) বৈপরীত্য মিলন ও সংগ্রাম বস্তুর পরিবর্তনশীলতার উৎস, বস্তুর মধ্যেই নিহিত থাকে। বস্তুর মধ্যেই তার বৈপরীত্য থাকে। বৈপরীত্যের মিলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বস্তুজগতের পরিবর্তন ঘটে।

ii) দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি অনুসারে বিকাশের অর্থই হল উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে বিকাশ। উদাঃ হিসাবে বলা যায় -- ক্রমাগত বাষ্প বাড়তে থাকলে জল একসময় বাষ্পে পরিণত হয়। আবার ওই জল ক্রমশঃ ঠান্ডা হতে হতে জমে বরফ হয়ে যায়। বাষ্প ও বরফের অবস্থাগত ও গুণগত পরিবর্তন কিন্তু আস্তে আস্তে হয় না। পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে তার রূপান্তর ঘটে। এছাড়াও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অনুসারে পুরাতনকে অস্বীকার না করলে নতুনের আবির্ভাব হতে পারে না। হেগেল তার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় তিনস্তর ব্যক্ত করেছেন -- বাদ, প্রতিবাদ এবং সমবাদ। কোনো চিন্তা ঘটনার প্রথম স্তরটি হলো বাদ, একসময় সেই নতুন অবস্থাটিও পুরাতন হয়ে যায় পরবর্তী বিকাশের ফলে তাকে বলা হয় প্রতিবাদ। এই উভয়ের ব্যবস্থার সমন্বয়ে যে নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয় সেটি হল সমবাদ। এই অবস্থাকেই মার্কস্ ''নেতির নেতিকরণ'' বা 'অস্বীকৃতির স্বীকৃতি'' বলে অভিহিত করেছেন।

মার্কসীয় দ্বন্দ্বতত্ত্বে প্রধানতঃ দু'ধরণের দ্বন্দ্বের কথা বলা হয় -- i) বৈর ও ii) অবৈর দ্বন্দ্ব। সমাজের মধ্যকার পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলির সম্পর্ক থেকে বৈর দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ঘটে। উদাঃ - পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণির সঙ্গে শ্রমিকের দ্বন্দ্ব হল বৈর দ্বন্দ্ব।

কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে শোষক ও শোষিতের প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব না থাকায় বৈর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটলেও সেখানে শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে দ্বন্দ্ব, গ্রাম ও শহরের মধ্যে দ্বন্দ্ব, মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রভৃতি থেকে যায়। এরূপ দ্বন্দ্বকেই অবৈর দ্বন্দ্ব বলা হয়। মার্কসের মতে সমাজতন্ত্রকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই এরূপ দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো সম্ভব।

(b) ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ঃ-

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মানব ইতিহাসে সামাজিক, অর্থনৈতিক সমাজের আবির্ভাব, বিকাশ ও পরিবর্তনের সাধারণ নিয়মকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বলা হয়। মার্কস্ মানব ইতিহাস পর্যালোচনা করে প্রমাণ করেছেন যে মানুষের প্রয়োজনীয় উৎপাদন পদ্ধতির প্রভাবে মানবসমাজের মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অর্থনীতি হল সমাজের ভিত এবং সেই ভিতের উপর দাড়িয়ে থাকে আইনব্যবস্থা, কলা, ধর্ম, সাহিত্য ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তিনটি মূল সূত্রের সাহায্যে বলা যেতে পারে -- i) মানুষ তার সৃজনশীল শ্রমকে ব্যবহার করে উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে তোলে। ঐ উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের সাথে সমাজব্যবস্থার রূপান্তরের প্রশ্নটি জড়িত।

ii) মার্কস্ দেখিয়েছেন ব্যক্তি তার শ্রমের মাধ্যমে বাস্তব পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে একটি সামাজিক পরিমন্ডলী গড়ে তোলে এবং শ্রমের প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশকে পরিবর্তন করে।

iii) উৎপাদনের দুটি পদ্ধতি, তা হল -- উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক। শ্রমিক ও তার শ্রমক্ষমতা, আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি হল উৎপাদন শক্তি। উৎপাদন সম্পর্ক বলতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষে মানুষে তথা শ্রেণিতে শ্রেণিতে উৎপাদনভিত্তিক পারস্পরিক সংযোগ বা সম্পর্ককে বোঝায়। মার্কসের মতে উৎপাদন পদ্ধতির দুটি অংশের মধ্যকার দ্বন্দ্বই উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তন আনে।

স্ট্যালিনের মতে ইতিহাস - বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হল উৎপাদনের নিয়ম, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের নিয়ম, উৎপাদন সম্পর্ক এবং সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মগুলি আলোচনা ও প্রকাশ করা। মার্কস্ মনে করেন পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপাদন শক্তির বিকাশ ঘটে। সমাজ বিবর্তনের কোনো স্তরেই উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন বিনা সংঘর্ষে সম্পন্ন হয় না।

তাই মার্কস্ বলেছেন ''প্রতিটি পুরাতন সমাদের গর্ভে যখন কোনো নতুন সমাজের উদ্ভব হয় শক্তি তখন ধাত্রী হিসাবে কাজ করে।'' মার্কস দেখিয়েছেন উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে বৈরীমূলক সম্পর্ক দেখা দিলেই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজে বিপ্লব ঘটে।

(c) **উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব ঃ-**

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডোর মূল্যের শ্রমতত্ত্ব আলোচনার সূত্র ধরে মার্কস তার বিখ্যাত উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কসের মতে কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও শ্রমের সমন্বয়ে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তার সবটাই মূলতঃ মানুষের শ্রমের ফল। পুঁজিবাদী সমাজে যেহেতু পুঁজিপতিরা উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিক সেহেতু জীবন ধারণের জন্য তাদের কাছে শ্রম বিক্রয় করতে শ্রমিকরা বাধ্য হয়। কিন্তু শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্যের পরিমাণ এবং শ্রম-প্রক্রিয়া যে পরিমাণ মূল্য সৃষ্টি করে তা কখনোই সমান হয় না অর্থাৎ শ্রমিক তার মজুরির সমান মূল্য সৃষ্টি করতে যেটুকু সময় কাজ করে সেই সময়কে ''আবশ্যিক শ্রম সময়'' বলে। কিন্তু কোনোরকম পারিশ্রমিক বা মজুরি না পেয়েও কেবল পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করতে শ্রমিক যতখানি সময় কাজ করতে বাধ্য হয় সেই সময়কে ''উদ্বৃত্ত শ্রম সময়'' বলে।

অর্থাৎ যধি করা হয় শ্রমিক যে পরিমাণ শ্রমদান করে তা দিয়ে c পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ঐ c পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য শ্রমিককে M পরিমাণ অর্থ মজুরি দেওয়া হয় কিন্তু c পরিমাণ দ্রব্য মালিক বিক্রি করে M/ পরিমাণ অর্থে।
সুতরাং উদ্বৃত্ত মূল্য হল (M/-M) টাকা।

(d) শ্রেণি সংগ্রাম ঃ-

মার্কসের মতে উৎপাদন ব্যবস্থার একটি বিশেষ স্তরে ঐতিহাসিক কারণে শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। মার্কস্ দেখান শ্রেণিবিভক্ত সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রেণিগুলির সম্পর্ক যদি পরস্পরবিরোধী হয় তবে অনিবার্যভাবে তাদের স্বার্থগত দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে এবং শ্রেণিসংগ্রামের আত্মপ্রকাশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। মার্কস্ - এঙ্গেলস্ তাদের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে ঘোষণা করেন আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস হল শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস। মার্কসের মতে শ্রেণিসংগ্রাম তিনভাবে চলতে পারে -- i) অর্থনৈতিকভাবে ii) মতাদর্শগতভাবে এবং iii) রাজনৈতিকভাবে। মার্কসের মতে পুঁজিবাদী যুগে অর্থনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই আদর্শগত রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার উপর

মার্কস্‌বাদীরা অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। এরূপ সমাজে অব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক অসন্তোষই যথেষ্ট নয়। শ্রমিকদের শ্রেণি সচেতন হয়ে উঠতে হবে। এই মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতে গিয়ে শ্রমিকশ্রেণিকে একটি বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে হয়। শ্রমিকদের শ্রেণিসচেতন ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী করে গড়ে তোলার জন্য মার্কসবাদে দীক্ষিত একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন। মার্কসবাদীদের মতে শ্রেণিসংগ্রামের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করা। এই রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক দলের হাতে। রাজনৈতিক শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণি বুর্জোয়া শ্রেণির হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলে। শুরু হয় সমাজতন্ত্র গঠন প্রক্রিয়া।

(e) রাষ্ট্রতত্ত্ব ঃ-

সমাজ বিবর্তনের একটি বিশেষ স্তরে উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্রগত পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে। মার্কসের রাষ্ট্রচিন্তা প্রধানতঃ মার্কস - এঙ্গেলস্‌ রচিত "The Communist Manifesto", এঙ্গেলসের "The Origin of the Family", "Private Property and the State" এবং লেনিনের লেখা "The State and Revolution" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত্তি হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। মার্কস্‌ের মতে সমাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব পণ্য বিনিময় ব্যবস্থার প্রচলন, শ্রমবিভাগের প্রবর্তন ইত্যাদির ফলে সমাজজীবনের অভুতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়। এঙ্গেলসের ভাষায় ''সভ্যসমাজে রাষ্ট্রই সমাজকে একত্র ধরে রাখে এবং প্রতিটি বিশিষ্ট পর্বেই রাষ্ট্র হল একমাত্র শাসকশ্রেণির রাষ্ট্র এবং সর্বক্ষেত্রেই তা হল মূলতঃ শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণিকে দমন করার যন্ত্র মাত্র। মার্কস্‌ মনে করেন ক্রমবর্ধমান ও বিরামহীন শোষণে বঞ্চিত শ্রমিকশ্রেণিকে বলিষ্ঠ সংগঠন সৃষ্টি করে সামাজিক ন্যায় ও সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে বৈপ্লবিক পন্থা গ্রহণ করতে হয়। সশস্ত্র সংগ্রামের ভিতর দিয়ে শোষক ও শাসকশ্রেণিকে পরাজিত করে শ্রমিকশ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বপ্রধান লক্ষ্য শ্রেণিশোষণের অবসান ও শোষণহীন সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন।

(f) বিপ্লব সংক্রান্ত তত্ত্ব ঃ-

মার্কসবাদ মনে করে সমাজবিকাশের প্রক্রিয়ায় শাসকশ্রেণির পরিবর্তন, ঘটিয়ে

সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন এনে সমাজ প্রগতির মূল উৎস উৎপাদিকা শক্তির পূর্ণ বিকাশের বিকাশের সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করাকে বলে সমাজবিপ্লব। হাবার্ট আপ্তেকার-এর মতে বিপ্লব হল ''এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, যা এমন এক সামাজিক রূপান্তরের দিকে এগিয়ে যায় ও তাতে চূড়ান্তভাবে উপনীত হয় যেখানে একটি শাসকশ্রেণি অপরটির দ্বারা অপসৃত হয়। এই নতুন শ্রেণিটি পুরাতনটির তুলনায় উন্নততর উৎপাদন ক্ষমতা ও সামাজিক দিক থেকে প্রগতিশীল সম্ভাবনাকে প্রতিফলিত করে।''

মার্কস্-এঙ্গেলস্ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শর্ত হিসাবে এর বিষয়গত ও বিষয়ীগত উপাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বিপ্লবের বিষয়গত শর্ত হল -- i) পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিজস্ব দ্বন্দ্ব এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ার অন্তর্দ্বন্দ্ব। ii) শোষিত শ্রেণির দুঃখ, যন্ত্রণা, বঞ্চনা চরম আকার ধারণ করলে। iii) শোষিত শ্রেণির মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের মানসিক প্রস্তুতি। বিষয়ীগত শর্ত বলতে বোঝায় -- i) শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা, ii) বিপ্লবে সামিল হওয়ার জন্য গণশক্তির বিকাশ, iii) জনগণের সংগ্রাম ও বিপ্লবে নেতৃত্বদানের উপযোগী রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব। এই বিষয়গত ও বিষয়ী গত শর্ত পালিত হলে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত বলে মনে করা যেতে পারে। মার্কস্ - এঙ্গেলস্ তাঁদের ''কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো''-তে প্রলেতারীয় বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবীতা এবং নিরবচ্ছিন্ন বিপ্লবের তত্ত্ব প্রচার করেন। মার্কস বিপ্লবকে ইতিহাসের চালিকা শক্তি'' বলে বর্ণনা করেছেন।

মূল্যায়ণ ঃ-

মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ মার্কস্বাদের মূল দার্শনিক ভিত্তি। কিন্তু যারা মার্কসীয় তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তারা মনে করেন দ্বন্দ্বতত্ত্বের প্রয়োগ বস্তুজগতে সম্ভব নয়। এই তত্ত্ব একমাত্র ভাবজগতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন বস্তুজগৎ থেকেই ভাবজগৎ আবর্তিত হয়। সুতরাং মার্কসবাদ কখনোই একে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগের কথা বলেনি।

মার্কস্বাদের ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সমালোচনা করে বলা হয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ইতিহাসের অমোঘ নিয়মের প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কার্লপপার মনে করেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা একান্তভাবেই যান্ত্রিক। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত ও উপরিসৌধ সংক্রান্ত ব্যাখ্যাকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সমালোচকদের মতে মার্কসের ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার দ্বারা অর্থনৈতিক ঘটনার উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পরিবর্তে মানুষের জীবনের ভাব, আদর্শ, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে তিনি বহুলাংশে উপেক্ষা করেছেন। মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের বিরূদ্ধে সমালোচনা করে বলা হয় যে মার্কসীয় মতবাদ অনুযায়ী আর্থিক কাঠামোই হল রাষ্ট্রের প্রধান ভিত্তি। অপরদিকে রাজনীতি, আইন, মতাদর্শ ইত্যাদি হল উপরিসৌধ। কার্ল পপারের যুক্তিতে মার্কস্ এইভাবে রাজনীতিকে বন্ধ্যা করে ফেলেছেন। সমালোচকেরা আশঙ্কা করেন মার্কস্ নির্দেশিত সংঘর্ষ, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে সমাজ গঠিত হয় তা সুস্থ, শান্তিপ্রিয় ও সমৃদ্ধশালী হতে পারে না।

মার্কসের শ্রেণিতত্ত্বকে সমালোচনা করে বলা হয় সমাজের মূল দ্বন্দ্ব ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে, শ্রেণির সাথে শ্রেণির নয়। শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্বের ভিত্তি হল শোষণের উপর গড়ে ওঠা শাসক ও শোষিতের সম্পর্ক। কিন্তু বুর্জোয়া ব্যবস্থা ইতিহাসের নিয়মে এমনভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে যা ঐ শোষণব্যবস্থার চরিত্রে পরিবর্তন আনছে।

মার্কসের বিপ্লবের তত্ত্বের সমালোচনা করে বলা হয় অসাংবিধানিক উপায়ে বিধিবদ্ধ সরকারকে পরিবর্তন করা অগণতান্ত্রিক কাজ। এরূপ অকাম্য ও অগণতান্ত্রিক কাজকে তত্ত্বগত রূপ দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে যখন সাম্যবাদী সমাজ গঠিত হবে তখন উৎপাদনের প্রাচুর্য্যের জন্য মানসিক ও দৈহিক শ্রমের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য থাকবে না। এরূপ সমাজে সর্বপ্রকার শ্রেণিশোষণের অবসান ঘটার ফলে শোষণের যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকবে না স্বাভাবিকভাবে তার বিলুপ্তি ঘটবে। এছাড়াও বিপ্লব করতে গিয়ে বিপ্লবী জনগণকে যে মূল্য দিতে হয় তার জন্য দায়ী বুর্জোয়া শাসক ও শোষক শ্রেণি কারণ তারাই বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে বিপ্লবীদের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করে। তাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া নিছক বিবর্তনের মাধ্যমে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ অসম্ভব।

অথবা, রাষ্ট্রসম্পর্কের গান্ধিজির ধারণা ব্যাখ্যা করো।

উঃ ''হিন্দ স্বরাজ'' নামক গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে গান্ধিজী তাঁর রাষ্ট্র সম্পর্কিত ভাবনা প্রকাশ করেছেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর লিখিত "The Story of My Experiments with Truth" নামক আত্মজীবনী, বিভিন্ন প্রবন্ধ, পুস্তক- পুস্তিকা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তিনি রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিষয়ক আলোচনা করেছেন। গান্ধিজীর রাষ্ট্রসংক্রান্ত চিন্তা টলস্টয় রচিত "The Kingdom of God is Within You", "The Slavery of Our Times",- থোরো রচিত "Essay On Civil Disobedience" প্রমুখের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

গান্ধিজীর রাষ্ট্রসম্পর্কিত ভাবনার মূল নির্যাস হল -- তিনি মনে করতেন হিংসা হল রাষ্ট্রের নির্যাস এবং ঐ রাষ্ট্রীয় হিংসা শুধুমাত্র শারীরিক ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের দ্বারা ব্যক্তিত্ব ধ্বংস মানজাতির সর্বনাশ করে। গান্ধীর জীবনের চরম বিশ্বাসের আশ্রয়স্থল হল অহিংসা। তাঁর ভাষায় ''রাষ্ট্র হল কেন্দ্রীভূত ও সংগতি হিংসার প্রতীক। ব্যক্তিমানুষের একটি আত্মা আছে কিন্তু রাষ্ট্র হল আত্মহীন যন্ত্র মাত্র। হিংসার মাধ্যমে তার উদ্ভব ঘটেছে বলে সহিংস বলপ্রয়োগ ছাড়া তাকে বিচ্ছিন্ন করা করা সম্ভব নয়।''

নৈতিক দৃষ্টিকোণ --

গান্ধী রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি অবাধ শক্তির আধার রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার বিরোধী ছিলেন। তিনি জনগণের সার্বভৌমিকতা আস্থাশীল ছিলেন। তিনি মনে করতেন নৈতিক অধিকারের উপর দাঁড়িয়ে নিজের ভাগ্য গড়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা বাধার সৃষ্টি করে। এমনকী আধুনিক যুগের সংসদীয় সার্বভৌমিকতার ধারণাও তাঁকে আকর্ষণ করেনা। তাঁর কাছে রাষ্ট্রীয় অবাধ সার্বভৌমিকতার বিকল্প হল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।

সর্বোদয় --

গান্ধীর বিকেন্দ্রীত রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি হবে গ্রামীণ সমাজ। যে সমাজ তাঁর অর্থনীতি ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে স্বয়ংভর হবে। আর্থিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় সকল চাহিদাই একটি গ্রামের মানুষ বৃহৎ যন্ত্র বা শিল্পের সাহায্য না নিয়ে নিজেরাই মেটাবে। তাঁর মতে এমন এক বিকেন্দ্রীত শাসনব্যবস্থা নির্মিত হবে যার কেন্দ্রে থাকবে গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রামকেন্দ্রিক আর্থ-রাজনৈতিক বিকাশের এই বিকেন্দ্রীত

মডেলটিকেই গান্ধীজী ‘‘সর্বোদয়’ আখ্যা দিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রের বহুমুখী কর্মক্ষেত্রে বিরোধিতা --

তিনি মনে করতেন মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশই যাবতীয় অগ্রগতির প্রধান ভিত্তি। রাষ্ট্রের বহুমুখী কার্যের তত্ত্বে তিনি আদৌ আস্থাশীল ছিলেননা। তাই রাষ্ট্রের অধিকাংশে কাজ স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে অর্পণ করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করতেন। তবে তিনি একথাও বলেছেন এমন কতগুলি কাজ রয়েছে যেগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়া সম্পাদিত হতে পারেনা। তাই তিনি রাষ্ট্রের হাতে যেসব ক্ষমতা প্রদান করতে চেয়েছেন, সেগুলি হল -- অপরাধীদের সংশোধন, ন্যায়-নীতির প্রতিষ্ঠা, আদালত গঠন, অধিকার রক্ষা, অপরাধমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ, কর ধার্য, শিক্ষার সম্প্রসারণ ইত্যাদি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল অহিংস রাষ্ট্রে অপরাধ ও বলপ্রয়োগ ক্রমশঃ হ্রাস পাবে।

রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্র --

গান্ধী রাষ্ট্রহীন সমাজ গড়ার পক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করতেন প্রত্যেক নিজেকে এমনভাবে পরিচালনা করবে যাতে সে তার প্রতিবেশীর পথে প্রতিবন্ধক না হয়ে দাঁড়ায়। গান্ধীর আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ কেবল অহিংসানীতির মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এরূপ সমাজে সকলের জন্য একইধরণের স্বাধীনতা থাকবে। প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সমাজের সেবা করবে ও সমাজের বুক থেকে সর্বপ্রকার শোষণের অবসান ঘটবে। গান্ধীজির রাষ্ট্রহীন গণতন্ত্রের ভিত্তি হবে গ্রাম সমবায় ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উদ্যোগ। তাঁর কল্পিত আদর্শ সমাজকে রামরাজ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে সাম্য ও অহিংসা নীতির ভিত্তিকে শ্রেণিহীন ও শোষণহীন সমাজ গঠিত হবে। গান্ধীর মতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কোনো লক্ষ্য হতে পারে না -- জনগণকে নৈতিক ও উন্নত জীবনে পৌঁছে দেওয়ার উপায় মাত্র।

মূল্যায়ন --

গান্ধিজী পশ্চিমী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরম বিরোধী ছিলেন। এরূপ গণতন্ত্রকে তিনি ‘‘স্বৈরতন্ত্র’’ বলে চিহ্নিত করেছেন। ১৯৪০ সালে তিনি বলেছিলেন ‘‘ইউরোপীয় গণতন্ত্র হল গণতন্ত্রের অস্বীকৃতি মাত্র’’। সমালোচকেরা অনেকে গান্ধিজীকে ‘‘দার্শনিক নৈরাজ্যবাদী ’’ এবং অনেকে তাকে ‘‘ধর্মীয় নৈরাজ্যবাদী’’ বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে গান্ধি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার চরম বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কখনোই রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার কথা

বলেননি।

(গ) ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যদা আলোচনা করো।

উঃ ভারতীয় সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় ৭৪নং ধারায় বলা হয়েছে ভারতে মন্ত্রীসভার শীর্ষে একজন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তিনি ব্যাপক ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করে থাকেন। ব্রিটেনের মত ভারতের প্রধানমন্ত্রীকেও “Keystone of the Cabinet Arch” বলা হয়। সংবিধানের ৭৫(১) নং ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করবেন। সংসদীয় ব্যবস্থার রীতি অনুসারে লোকসভায় যে দল বা যে কোয়ালিসন বা মোর্চা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সেই দল বা মোর্চা লোকসভার নেতা বা নেত্রীকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে ----

(১) মন্ত্রীসভার নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী --

সংবিধান অনুসারে যে রাজনৈতিক দল বা দলের মোর্চা লোকসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, রাষ্ট্রপতি সেই দল বা মোর্চার নেতাকে মন্ত্রীসভা গঠনে আহ্বান জানায়। প্র ধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। মন্ত্রীসভা গঠনের সময়ে প্রধানমন্ত্রীকে সতর্কভাবে কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিতে হয়। যেমন -- নিজ দল বা মোর্চার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যাতে মন্ত্রীসভায় স্থান পান, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অর্থাৎ তপশিলী জাতি ও অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিরা যাতে যথাযথভাবে স্থান পায় ও পরবর্তী দলীয় নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী ব্যক্তিরা যাতে মন্ত্রীত্বের পদ পান, সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিদের মন্ত্রীত্ব প্রদান। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করেন, মন্ত্রীসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযোগ রক্ষা করেন, প্রভৃতি।

(২) ক্যাবিনেটের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী --

প্রধানতঃ প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা সিদ্ধান্ত ও নীতি গৃহীত হয়। অনেকে প্রধানমন্ত্রীকে সমমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অগ্রগণ্য বলে বর্ণনা করেন। ক্যাবিনেটের নেতা হিসাবে তিনি ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করেন, তাদের দপ্তরগুলির মধ্যে সংহতি রক্ষা করেন। ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করাও তার অন্যতম কাজ। প্রধানমন্ত্রীর

পরামর্শক্রমেই রাষ্ট্রপতি ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের নিয়োগ ও পদচ্যুত করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর সাথে কোনো মন্ত্রীর নীতিগতভাবে বা কোনো কারণে বিরোধ বাধলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। উদা ঃ হিসাবে সি. ডি. দেশমুখ, এম. সি. চাগলা, মহাবীর ত্যাগী, অশোক মেহতা, মোহন ধাবিয়া প্রমুখের কথা বলা যায়। ক্যাবিনেট কমিটি গুলির হাতে যেসব বিষয়ে কমিটিগুলি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে বিষয়ে সাধারণতঃ ক্যাবিনেটের সভায় কোনো আলোচনা হয়না কারণ প্রধানমন্ত্রী ঐসব কমিটির সভাপতি থাকেন বলেই অতি সহজেই তিনি কমিটিগুলিতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এইভাবেই ক্যাবিনেটের নেতা হিসাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মতই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বলে তাকে ''ক্যাবিনেটের মধ্যমণি'' বা ''তারকামন্ডলীর মধ্যে বিরাজমান চন্দ্র'' বলে অভিহিত করা হয়।

(৩) লোকসভার নেতা বা নেত্রী হিসাবে প্রধানমন্ত্রী --

লোকসভার অধিবশেন আহ্বান, এমনকী লোকসভার অধিবেশন কতদিন চলবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারের প্র ধান মুখপাত্র হিসাবে তিনি লোকসভায় সরকারি নীতিসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। সভায় বিতর্ক চলাকালীন কোনো মন্ত্রী কোনোরূপ সমস্যার সম্মুখীন হলে তাকে সাহায্য করা প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম দায়িত্ব। লোকসভায় গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো বিল পাস করার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর। কেবল লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রী হিসাবেই নয়, সভায় বিরোধীপক্ষের সাথেও সদ্ভাব বজায় রেখে সুষ্ঠভাবে কার্য কম্পাদন করার দায়িত্বও প্রধানমন্ত্রীর ।

৪) শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা --

সরকারের শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রীসভার সকল সিদ্ধান্ত, নীতি রাষ্ট্রপতিকে জানানো। কোনো বিষয়ে রাষ্ট্রপতি জানতে চাইলে তাকে অবহিত করা প্রধানমন্ত্রী কর্তব্য। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রীসভার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করেন। বাস্তবে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে থাকেন।

৫) জাতির নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী ---

প্রধানমন্ত্রী জাতির নেতা হিসাবে বিশেষ জনসভায় উপস্থিত হন এবং জনসংযোগ রক্ষার মাধ্যমে সরকার ও দলের জনপ্রিয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। বিশেষ করে জাতির সংকটের সময় বা বিশেষ কোনো জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হলে প্রধানমন্ত্রী তার জনপ্রিয়তা ও কূটকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করেন

(৬) নিয়োগসংক্রান্ত ক্ষমতা --

ভারত সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। ভারতের মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষক, নির্বাচন কমিশন, অ্যাটনি জেনারেল, কেন্দ্রীয় জনকৃত্যক কমিশন, রাজ্যপাল, বিচারক প্রভৃতি পদগুলি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে থাকেন।

(৭) সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা মোর্চার নেতা --

প্রধানমন্ত্রী কেবলমাত্র সরকারের প্রধান নন, তিনি নিজ দলেরও অন্যতম নেতা। দলের নেতা হিসাবে তিনি নীতিনির্ধারণ, দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি, দলের বিভিন্ন কর্মসূচী জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন, দল বা মোর্চার নেতা বা নেত্রী দলের বা মোর্চার ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করতে হয়। অনেক সময়ই নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা, ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়।

(৮) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ---

প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারের মুখ্য নীতি নির্ধারক ও মুখপাত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থাকেন। আন্তর্জাতিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে তাকে অত্যন্ত সতর্ক ভূমিকা পালন করতে হয়। এছাড়া ভারতবাসীর হয়ে বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের স্বাগত জানানো, শুভেচ্ছা বিনিময় ও বিশেষ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পররাষ্ট্র নীতির ব্যাখ্যা তিনি করে থাকেন। গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক চুক্তিতেও তিনি স্বাক্ষর করেন।

পদমর্যাদা ---

ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী এক অনন্যসাধারণ পদমর্যাদার অধিকারী। সংবিধানে সরাসরি বলা না হলেও তিনি দেশের প্রকৃত প্রধান শাসক। বস্তুত রাষ্ট্রপতির নামে দেশের শাসন পরিচালিত হয় ঠিকই, কিন্তু তার প্রকৃত কর্ণধার হলেন প্রধানমন্ত্রী। এটাই সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য যা আমরা ব্রিটিশ ওয়েস্টমিনিষ্টার মডেল থেকে গ্রহণ করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য -- 'পদমর্যাদা' বলতে কেবল গরিমা নয় তার সঙ্গে ক্ষমতাবান হওয়াও বোঝায়। এইদিক থেকে গরিমা ও ক্ষমতার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে প্রধানমন্ত্রীর পদটির মধ্যে।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব --

প্রধানমন্ত্রী জাতির সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর এই রাজনৈতিক পরিচয় তাঁকে ভারতের সবচেয়ে অনু মোদনতার অধিকারী করেছে। তবে মার্কিন রাষ্ট্রতির তুলনায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কারণ তিনি প্রাথমিকভাবে একজন সাংসদ এবং সাংসদ হিসাবেই তিনি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল।

১৯৭৬ এর ৪২ তম সংবিধান সংশোধন স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। এই সংযোজন অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক পদমর্যাদাকে তাঁর প্রকৃত ক্ষমতার পাশাপাশি যথেষ্ট উন্নীত করেছে। তবে প্রকৃত শাসক হলেও ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে কাজ করতে হয় গণতান্ত্রিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ার মাধ্যেই। তিনি একজন দায়িত্বশীল ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্ব হিসাবেই তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। এপ্রসঙ্গে এ্যাসকুইন বলেছেন "The office of the Prime Minister is what its holder chooses to make it" পরিশেষে সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে Gladstone বলেছেন "......... nowhere is there a man who has so much power, with so little to show for it ....

অথবা, ভারতীয় সংসদের গঠন ও কার্যবলি আলোচনা করো।

উঃ

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভারতে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠন করা হয়েছে । সংসদের উচ্চকক্ষের নাম হল রাজ্যসভা ও নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা। সংবিধানে ৭৯ নং ধারা অনুযায়ী ভারতে সংসদ বলতে রাষ্ট্রপতিসহ সংসদের উভয়কক্ষকে বোঝানো হয়। বর্তমানে প্রতিটি দেশের আইনসভাকেই বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম সম্পাদন করতে হয়। সংসদের কার্যাবলীকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে ---

১) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা --

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী ভারতে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠন করা হয়েছে। সংসদের উচ্চকক্ষের নাম হল রাজ্যসভা ও নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা। সংবিধানের ৭৯ নং ধারা অনুযায়ী ভারতে সংসদ বলতে রাষ্ট্রপতিসহ সংসদের উভয়কক্ষকে বোঝানো হয়। বর্তমানে প্রতিটি দেশের আইনসভাকেই বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম সম্পাদন করতে হয়। সংসদের

কার্যাবলীকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে ---

(১) আইন প্রনয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা --

ভারতীয় সংবিধানের ২৪৬ নং ধারা অনুযায়ী সপ্তম তপশিলে সংসদ কি কি বিষয়ে আইন প্রণয়ন করবে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তিনটি তালিকার মাধ্যমে এই ক্ষমতাগুলি বন্টন করা হয়েছে --- কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা। কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত ৯৭টি বিষয়ে সংসদ বা পার্লামেন্ট এককভাবে আইন প্রণয়ন করার অধিকারী। আবার রাজ্য তালিকাভুক্ত ৬৬টি বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার রাজ্যের । যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভূক্ত ৪৭টি বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার অধিকার কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের তবে বিশেষ অবস্থায় ভারতীয় সংসদ রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়েও আইন প্রণয়ন করতে পারে। যেমন -- ২৪৯ নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যসভা যদি দুই তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাব পাশ করে যে জাতীয় স্বার্থে রাজ্য তালিকাভুক্ত কোনো বিষয়ে সংসদের আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ২৫২ নং ধারা ২ বা তার বেশি সংখ্যক রাজ্য বিধানমন্ডলী মনে করে যে রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয়ের উপর সংসদের আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, তবে সংসদ রাজ্যগুলির জন্য ঐসব নির্দিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারবে। সংবিধানের ২৫০নং ধারা অনুযায়ী জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে সংসদ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

এছাড়া যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে কোনো সমস্যা উপস্থিত হলে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের আইন বলবৎ হবে।

অর্থবিল সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লোকসভা ও রাজ্যসভা সমক্ষমতার অধিকারী। যেকোনো সরকারি বিল পার্লামেন্টের যেকোনো কক্ষে উত্থাপিত হতে পারে। একটি কক্ষে গৃহীত হওয়ার পর বিলটি অন্য কক্ষের সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়। উভয় কক্ষের সম্মতি লাভের পর বিলটিকে অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হয়। অর্থবিল ছাড়া অন্য বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি জ্ঞাপন করতেও পারেন কিংবা নাও পারেন।

২) মন্ত্রীসভা গঠন --

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতারাই মন্ত্রীসভা গঠন করেন। সাধারণতঃ লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যদের মধ্য থেকে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যরা নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত

করেন। এরপর প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য সদস্যরা নিযুক্ত হন। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, পার্লামেন্টের সদস্য নন এমন কোনো ব্যক্তিকেও রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভায় স্থান দিতে পারেন। কিন্তু মন্ত্রী সভায় স্থান পাওয়ার পর তাকে ৬ মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের যেকোনো কক্ষের সদস্য হতে হবে। পার্লামেন্টের আস্থা হারালে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। পার্লামেন্টের আস্থা বলতে লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনকে বোঝায়।

৩) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা --

সংবিধানে ২৬৫ ও ২৬৬ নং ধারা অনুসারে কর ধার্য, কর সংগ্রহ ও ব্যয়নির্বাহ পার্লামেন্টীয় আইন ছাড়া করা যায়না। অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে লোকসভার একক প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। যেকোনো অর্থবিল কেবলমাত্র লোকসভাতেই উত্থাপিত হতে পারে। এমনকী কোনো বিল অর্থবিল কিনা সে বিষয়েও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন লোকসভার অধ্যক্ষ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, লোকসভায় আলোচিত ও গৃহীত হওয়ার পর কোনো অর্থবিল রাজ্যসভায় পাঠানো হলে রাজ্যসভা ১৪ দিনের মধ্যে ঐ প্রস্তাব লোকসভায় ফেরৎ না পাঠালে ধরে নেওয়া হয় যে রাজ্যসভায় ঐ ব্যায় বরাদ্দ গৃহীত হয়েছে। ঐ বিলে রাজ্যসভা কোনো সংশোধন করলে তবে তা গ্রহণ করা বা না করা লোকসভার ইচ্ছাধীন।

তবে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যয়ের জন্য সংসদের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। যেমন -- রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভার সভাপতি, লোকসভার স্পীকার, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক প্রভৃতির বেতন সরকারের সঞ্চিত তহবিল থেকে ব্যয় করা হয়।

এছাড়া সরকারের আয়ব্যয় যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে -- ক) পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটি ও খ) এস্টিমেটস্ কমিটি। এই দুটি কমিটিতে লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয়কক্ষেরই সদস্য গ্রহণ করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির কাজ হল --- সরকার যে ব্যয় করে সে সম্পর্কে অডিটর ও কম্পট্রোলারের প্রতিবেদন বিবেচনা করে সংসদে একটি রিপোর্ট পেশ করা। দ্বিতীয়তঃ সরকারের ব্যয় বরাদ্দ পরীক্ষা করে ব্যয় সংকোচন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করে এস্টিমেটস্ কমিটি।

৪) নির্বাচন ও পদচ্যুত করার ক্ষমতা --

ভারতীয় সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্বাচক সংস্থার অংশ হিসাবে পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উপরাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কোনো সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগ

উত্থাপিত হলে, পার্লামেন্ট তাকে 'ইম্‌পিচমেন্ট' বা 'মহাবিচার' পদ্ধতির মাধ্যমে পদচ্যুত করতে পারেন। উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির ক্ষেত্রেও পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। এছাড়া সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরাক্ষক প্রমুখকে পদচ্যুত করার জন্য পার্লামেন্ট প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে।

৫) বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা --

সংসদ কোনো আদালতকে হাইকোর্টের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে। এছাড়াও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে হাইকোর্ট স্থাপন করা ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অবস্থিত হাইকোর্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি। এছাড়াও নিজের অবমাননার জন্য বা অধিকার ভঙ্গের জন্য পার্লামেন্টের উভয়কক্ষই অভিযুক্ত সদস্যকে বা বহিরাগতকে শাস্তি দিতে পারে।

৬) সংবিধান সংশোধন ক্ষমতা --

ভারতীয় সংবিধান সংশোধনের দুটি পদ্ধতি আছে --- প্রথমত ঃ ৩৬৮ নং ধারা অনুসারে সংবিধান সংশোধন করা। দ্বিতীয়তঃ ৩৬৮ নং ধারা প্রযোজ্য নয় এমন ব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধন। কয়েকটি নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংবিধান সংশোধনের জন্য অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভার সম্মতি প্রয়োজন। এই বিষয়গুলি হল -- রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, কেন্দ্র-রাজ্যের নিবহী কর্তৃত্বের পরিধি, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট সংক্রান্ত বিষয়, পার্লামেন্টে অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব এবং সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির পরিবর্তন। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে পার্লামেন্টের সংবিধান সংশোধনে একক ক্ষমতা আছে। সংবিধানের ২৪ তম ও ৪২ তম সংশোধন-এর পর সংশোধনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭) অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ --

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার নিম্নকক্ষ লোকসভার আস্থার সংসদের আস্থা নির্ভর করে। বিগত ৪ বছরের মধ্যে উদাঃ স্বরূপ বলা যায় লোকসভার অটলবিহারী বাজপেয়ী মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে হবার এবং এইচ. ডি. দেবগৌড়া ও আই.কে. গুজরালের মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে একবার করে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে তাদের মন্ত্রীসভার পতন ঘটনা।

৮) জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে --

ভারতীয় সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে যে তিনধরণের জরুরি ক্ষমতা দিয়েছে, তা হল -- জাতীয় জরুরি অবস্থা, রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা এবং আর্থিক জরুরি অবস্থা -- প্রতিটির ক্ষেত্রেই পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। তা না হলে ঐ ঘোষণা বাতিল হয়ে যাবে।

৯)　　জনমত গঠন ভূমিকা --

পার্লামেন্টে কোনো বিলের উপর আলোচনা, বিতর্ক প্রভৃতির মাধ্যমে জনসাধারণ সরকারের কার্যাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারেন। এছাড়াও পার্লামেন্টে যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে বা জ্ঞাতব্য বিষয়ে তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ করতে মন্ত্রীরা বাধ্য থাকেন। এর ফলে জনগণের রাজনৈতিক জ্ঞানের ব্যাপ্তি ঘটে এবং সুস্থ জনমত গঠিত হতে পারে।

১০)　　অন্যান্য ক্ষমতা --

ক) পার্লামেন্ট আইন প্রনয়ন করে কোনো রাজ্য থেকে কোনো অংশকে বিচ্ছিন্ন করে বা দুই বা ততোধিক রাজ্য বা কোনো ভূখন্ডকে অপর কোনো রাজ্যের সাথে সংযুক্ত করে নতুন রাজ্য গঠন করতে পারে। আবার খ) পার্লামেন্ট যেকোনো রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারে, গ) রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করতে পারে, ঘ) যে কোনো রাজ্যের নাম পরিবর্তন করতে পারে, এছাড়াও ঙ) অঙ্গরাজ্যের আইনসভার উচ্চকক্ষের প্রতিষ্ঠা বা বিলোপসাধনের ব্যাপারে পার্লামেন্ট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। সর্বশেষে বলা যায় চ) কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বা রাজ্যসরকারের অধীনে সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট বসবাসগত যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিতে পারে।

মর্যাদা ঃ-

ভারতীয় পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী বিশ্লেষণ করতে দেখা যায় এটি বৃটিশ পার্লামেন্টের মত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। আবার মার্কিন কংগ্রেসের মত ততোধিক দুর্বল নয়।

(ঘ)　　পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম পঞ্চায়েত-এর গঠন ও কার্যাবলি আলোচনা করো।

উঃ　　১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইন অনুসারে পঃবঃ ত্রিস্তরবিশিষ্ট পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি জেলাকে কয়েকটি ব্লকে বা পরস্পর সংলগ্ন কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি মৌজা বা পাশাপাশি কয়েকটি মৌজা নিয়ে গ্রাম গঠিত হয়। এরূপভাবে গঠিত প্রতিটি গ্রামে ঐ গ্রামের নামে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত থাকে। গ্রাম পঞ্চায়েত একটি যৌথ সংস্থা। গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা কমপক্ষে ৫ এবং সর্বাধিক ৩০ হতে পারে। কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা কত হবে তা পঃ বঃ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক স্থির করবেন। ১৯৯২ সালে প্রণীত ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঐ বছর পঃবঃ পঞ্চায়েত আইন সংশোধনের মাধ্যমে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সংশোধনী আইন অনুসারে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট

জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে তফশিলি জাতি ও উপজাতিগুলির জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঐসব সংরক্ষিত আসনের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ তফশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের আসনসংখ্যার অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়, ১৯৯৭ সালের পঃবঃ পঞ্চায়েত সংশোধনী আইন অনুসারে বর্তমানে প্রধান ও উপপ্রধানের পদও তপশিলি জাতি ও উপজাতি এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কার্যাবলী ঃ-

গ্রামপঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে তিনটিভাগে ভাগ করা হয় --

ক) অবশ্য পালনীয় কর্তব্য

খ) অন্যান্য কর্তব্য

গ) ইচ্ছাধীন কর্তব্য

ক) অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ঃ-

গ্রামপঞ্চায়েতের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হল --

১) জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও জননিষ্কাশন

২) বিভিন্ন মহামারী নিবারক ব্যবস্থা গ্রহণ করা

৩) পানীয় জল সরবরাহ ও জীবানুমুক্ত রাখা।

৪) জলপথ রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্মাণ

৫) গ্রামপঞ্চায়েতের অধীনস্ত ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি সংরক্ষণ

৬) সর্বজনীন পুষ্করীণি তত্ত্বাবধান করা

৭) জেলাশাসক, জেলা পরিষদ অথবা পঞ্চায়েত সমিতি গ্রামপঞ্চায়েতের এলাকা সম্পর্কে কোনো তথ্য জানতে চাইলে তা সরবরাহ করা।

৮) সমাজ ও উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছাশ্রম সংগঠিত করা।

৯) গ্রামপঞ্চায়েতের তহবিল নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা।

১০) পঞ্চায়েত আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে কর, অভিকর ইত্যাদি নির্ধারণ ও আদায় করা।

১১) পঞ্চায়েত আইন অনুসারে ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন ও পরিচালনা।

অন্যান্য কর্তব্য ঃ-

অন্যান্য কর্তব্য বলতে বোঝায় যেগুলির দায়িত্ব রাজ্যসরকার পঞ্চায়েতের হাতে প্রদান করে।

১) প্রাথমিক সামাজিক প্রযুক্তিগত বৃত্তিমূলক বয়স্ক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

২) গ্রামীণ ঔষধালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিশুমঙ্গল কেন্দ্র স্থাপন করা।

৩) খেয়াঘাট পরিচালনা করা।

৪) ক্ষুদ্রসেচ, জলপরিকল্পনা, উন্নতিসাধন ও জলসেচের ব্যবস্থা করা।

৫) চাষবাসের সম্প্রসারণ ও গবাদিপশুর খাদ্যসহ কৃষির উন্নতি সাধন করা।

৬) উন্নততর গবাদিপশুর রোগপ্রতিরোধের ব্যবস্থা করা।

৭) গ্রামে সরকারি সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম হিসাবে গড়ে তোলা।

৮) অনুর্বর জমিকে চাষের উপযোগী করে তোলা।

৯) রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক জনহীতকর কার্যাদির পক্ষে ব্যাপক প্রচার কার্য চালানো।

১০) বিদ্যুৎ বন্টন সহ গ্রামীণ এলাকার বৈদ্যুতিক করণের ব্যবস্থা করা।

১১) গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ কর্মসূচী গ্রহণ।

ইচ্ছাধীন কর্তব্য ঃ-

ইচ্ছাধীন কর্তব্য বলতে বোঝায় যেসকর কাজের দায়িত্ব পঞ্চায়েত নিজের হাতে তুলে নেয়।

১) জনসাধারণ কর্তক ব্যবহৃত রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা।

২) কুপ, পুষ্করীণি ও দিঘি খনন।

৩) বাজার স্থাপন ও নিয়ন্ত্রণ।

৪) সমবায়মূলক কৃষিবিপণী ও অন্যান্য সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন সাধন।

৫) সরকারি ঋণপ্রাপ্তি, বিতরণ ও পরিষদের পরিশোধনের বিষয়ে কৃষকদের সাহায্য ও পরামর্শদান।

৬) দুধ উৎপাদন ও মুরগী পালন।

৭) মৎসচাষের বিকাশ সাধন।

৮) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৯) খেলাধূলাসহ সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর বিকাশ সাধন।

১০) প্রতিবন্ধী ও মানসিক দিক থেকে পশ্চাদপদ ব্যক্তির কল্যানসহ সামাজিক কল্যানকর কর্মসূচী গঠন।

১১) গণবন্টন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন।

১২) জেলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদের পূর্বসম্মতিক্রমে জেলায় তাদের করণীয় জনকল্যানকর কর্ম সম্পাদন।

১৩) জনস্বাস্থ্য, জনস্বাচ্ছন্দ, জনসুবিধা কিংবা বৈষয়িক সমৃদ্ধি বিধায়ক যেকোনো কার্য সম্পাদন।

গ্রামপঞ্চায়েতের যে বিশেষ কয়েকটি ক্ষমতা রয়েছে তা হল --

১) জনস্বার্থ বিষয়ক যেকোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কয়েকটি গ্রামপঞ্চায়েত যুক্তকমিটি গঠিত হতে পারে।

২) গ্রামপঞ্চায়েতের সম্মতিক্রমে জেলাপরিষদ যেকোনো কাজের দায়িত্ব গ্রামপঞ্চায়েতের হাতে অর্পণ করতে পারে।

৩) রাজ্য সরকার যেকোনো সরকারি ভূসম্পত্তি আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রামপঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত করতে পারে।

৪) গ্রামপঞ্চায়েতের প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে যেকোনো সদস্য বা সব সদস্যের হাতে যেকোনো দায়িত্ব বা ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে।

অথবা, জেলা প্রশাসনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

উঃ ভারতীয় রাজ্যগুলিতে প্রশাসনের ভূখন্ডগত যৌথ একক হল জেলা। বস্তুত ভারতের জেলাপ্রশাসন এত বহুমুখী প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে যে সমগ্র রাজ্যপ্রশাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি হল জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসন শুধুমাত্র প্রশাসন ব্যবস্থাকেই সজ্জিত রাখে না। একদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করে জেলার সার্বিক উন্নয়ন পরিচালনা করে, অন্যদিকে জনগণের অভাব অভিযোগ ও প্রত্যাশাকে বাস্তব রূপ দেয় জেলাপ্রশাসন।

রাজ্যসরকার সাধারণত ভারতীয় প্রশাসন কৃত্যকের ভির থেকে জেলাশাসকদের নিযুক্ত করে, তবে রাজ্যের রাষ্ট্রকৃত্যক থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে জেলাশাসক নিযুক্ত হতে পারেন।

জেলাপ্রশাসনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল --

১) জেলার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও নাগরিকদের জীবনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

২) বিভিন্ন কর ও ডিউটি আদায় সহ রাজস্ব আদায় করা।

৩) ভূমি ও ভূমিসংস্কার সম্বন্ধীয় কার্যাবলী রূপায়িত করা।

৪) কৃষি ও সেচ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

৫) খাদ্য ও অপরিহার্যদ্রব্য সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৬) জেলা পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

৭) উন্নয়নমূলক কার্যসূচী রূপায়ন করা।

৮) জেলা কোষাগার ও ট্রেজারি পরিচালনা করা।

৯) বন্যা, খরার মত প্রাকৃতিক দুর্ভোগ, প্রভৃতি ক্ষেত্রে ত্রাণের বিলিবন্টন করা।

১০) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান করা।

১১) পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করা।

জেলাপ্রশাসনের কাঠামো প্রধানত তিনটি স্তরে বিভক্ত --

১) শীর্ষস্তরের কাঠামো

২) মহকুমা স্তরের কাঠামো

৩) ব্লক স্তরের কাঠামো

১। <u>শীর্ষস্তরের কাঠামো</u> ঃ-

একটি জেলাপ্রশাসনের শীর্ষে যে আধিকারিকের অবস্থান ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। কোথাও জেলা শাসক, কোথাও জেলা আধিকারিক, কোথাও উপকমিশনার, জেলাশাসক হলেন জেলাপ্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু, প্রতিটি জেলায় তিনি রাজ্যসরকারের প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত হন। পঃবঃ জেলা শাসককে সহায়তা করার জন্য কয়েকজন অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং কয়েকজন উপজেলাশাসক থাকেন।

ভারতের অধিকাংশ রাজ্যের জেলাগুলিতে রাজ্যসরকারের বিভিন্ন দপ্তরের জেলা কার্যালয়গুলি অবস্থিত। রাজ্য সরকারের জেলা দপ্তরের অধিকাংশ প্রধানকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে জেলাশাসকের নিয়ন্ত্রনাধীনে থেকে কার্য সম্পাদন করতে হয়।

২।	মহকুমা স্তরের কাঠামো ঃ-

সাধারণত ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যক থেকে মহকুমা শাসককে নিযুক্ত করা হয়। তবে রাজ্যকৃত্যক থেকেও নিয়োগ করা হয়ে থাকে। প্রতিটি জেলাকে ভৌগোলিক দিক থেকে কতকগুলি এককে ভাগ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন রাজ্যে এগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে এগুলিকে মহকুমা বলে। তামিলনাডু এবং মহারাষ্ট্রে এগুলির নাম হল রাজস্ব বিভাগ ও প্র্যান্ট। এই সব এককের ভারপ্রাপ্ত আধিকারীকদের নামও বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। পঃ বঃ এদের মহকুমা শাসক বলা হলেও উঃ প্রঃ এরা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, তামিলনাড়ুতে রাজস্ব বিভাগীয় আধিকারীক ও মহারাষ্ট্রে প্র্যান্ট মহকুমা আধিকারীক নামে পরিচিত। মহকুমা শাসককে কাজে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রীয় আধিকারীক এবং অধস্তন অন্যান্য কর্মচারী থাকেন।

৩।	ব্লকস্তরের কাঠামো ঃ-

একটি মহকুমাকে কতকগুলি এককে ভাগ করা হয়। প্রতিটি মহকুমা কতকগুলি ব্লকে বিভক্ত। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে একটি ব্লক গঠিত হয়। একটি ব্লকে সর্ব্বোচ্চ আধিকারীক হলেন B.D.O.। তিনি রাজ্যকৃত্যকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁকে সাহায্য করার জন্য কৃষি সমবায়, মৎস, পশুপালন, প্রভৃতিক্ষেত্রে এর সম্প্রাসারণ আধিকারীক বৃন্দ থাকেন। B.D.O. এর কাজে সাহায্য ও সহযোগীতা করার জন্য নানাধরণের অধস্তন কর্মচারী থাকেন।